শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মাখন চোর

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক
জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ-প্রদত্ত
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-সম্পর্কে বক্তৃতা

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ-
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট-এর পক্ষে
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীবামন গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ
৩৯, রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট্‌, কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে প্রকাশিত।

—ঃ প্রথম সংস্করণ ঃ—

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি
৮ নারায়ণ, ৫২৩ শ্রীগৌরাব্দ
২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ ; ইং ১০।১২।২০০৯

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান

১। **শ্রীশ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**, কোলেরডাঙ্গা লেন, নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৩। **শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ**, দানগলি, বৃন্দাবন, জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৪। **শ্রীগিরিধারী গৌড়ীয় মঠ**, দশবিশা, রাধাকুণ্ড রোড, গোবর্দ্ধন, (মথুরা) উঃ প্রঃ।
৫। **শ্রীবামন গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, ৩৯, রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট্‌, কলকাতা-৯।
৬। **শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম**, ঈশাপুর, (মথুরা) উঃ প্রঃ।
৭। **শ্রীদাউজী গৌড়ীয় মঠ**, দাউজী, পোঃ বলদেও (মথুরা) উঃ প্রঃ।
৮। **শ্রীরমণবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ব্লক বি/৩এ, জনকপুরী, নিউ দিল্লী—৫৮।
৯। **শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ**, বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া) পঃ বঃ।
১০। **শ্রীদামোদর গৌড়ীয় মঠ**, চক্রতীর্থ, পোঃ ও জেলা পুরী (উড়িষ্যা)।

মুদ্রাকর—
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৩৭/১/২, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৪

ভূমিকা

'মাখন চোর'-নামক এই ছোট গ্রন্থটি লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় এবং আলোকোজ্জ্বল লীলাসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিরচিত বৈদিক সাহিত্যরূপ কল্পবৃক্ষের পরিপক্ব ফল অমলপুরাণ 'ভাগবত-পুরাণে' এই লীলার প্রামাণিক উল্লেখ রয়েছে। এ জগতে বহু ধর্ম্মীয় গ্রন্থ রয়েছে—যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে বসবাসকারী বদ্ধ জীবের দিব্যস্বরূপ এবং ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত করান। যাই হোক, বেদ, বিশেষ করে ভাগবত পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে এইরূপে বিস্তারিত-ভাবে পরমতত্ত্বের (Absolute Tattva) ব্যক্তিসত্ত্বা, তাঁর অপ্রাকৃত জগৎ এবং ভগবান্ ও তাঁর নিত্যমুক্ত পার্ষদগণের অত্যন্ত সুমধুর প্রেমময় লীলা বর্ণনা করা হয়নি।

ভগবানের প্রতি বদ্ধ জীবগণের আকর্ষণ জাগানোর জন্য তিনি স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক তাঁর নিত্যধাম ও সপরিকরসহ অবতরণ করেন—তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ মহৎ চিল্লীলা প্রকাশ করার জন্য। খুব গভীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধাসহকারে এই লীলা শ্রবণ ও চিন্তন করলে জীবের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের সঙ্গলাভ এবং তাঁকে সেবা করার দৃঢ় মানসিকতা জাগরিত হবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজন্ম ও বাল্যলীলাস্থলী ভারতের শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সার সঙ্কলন হচ্ছে এই গ্রন্থ। শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ হচ্ছেন একজন আজন্ম রসিক ভক্ত এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি—যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা ও বাস্তবসত্য (Absolute Truth) সম্বন্ধে স্মরণে, চিন্তনে, কথনে গভীরভাবে নিমগ্ন। যে প্রেম ভক্ত ভগবানের জন্য অনুভব করে এবং ভগবান্ও ভক্তের প্রতি অনুভব করেন, তার অসাধারণ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাই এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই প্রেম নানাবিধ রসে প্রদর্শিত হতে পারে। কেহ সেবকরূপে, কেহ বন্ধুরূপে, কেহ পিতা-মাতারূপে এবং কেহবা পত্নী বা প্রেমিকারূপে ভগবানের প্রতি এই অপ্রাকৃত প্রেম প্রকাশ করতে পারে। এই ভূমিকা কোন কাল্পনিক বা তাৎক্ষণিক নয়। ইহা মুক্ত জীবাত্মার বাস্তব নিত্য স্বরূপধর্ম্মের পরিচয়। এই স্বরূপ-

পরিচয়ে ভক্ত পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক অনন্ত বৈচিত্র্যময় মনোমুগ্ধকর আধ্যাত্মিক ভাব বা রস (Sentiment) আদান-প্রদান করে। এই অপ্রাকৃত সুমধুর প্রেমের আদান-প্রদান বা ভাব বিনিময় শ্রবণ ও আস্বাদন করে একজন সাধক-সাধিকা ঐ অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে পারে।

'মাখন চোর'-নামে পরিচিত শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা সত্যি সত্যিই অতীব মনোমুগ্ধ-কর। স্বেচ্ছাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট গোয়াল বালকের ভূমিকায় তাঁর সুমধুর বাল্যলীলার দ্বারা মাকে ও সমস্ত ব্রজবাসিগণকে আনন্দ প্রদান করেছেন। তাঁর প্রিয় লীলাগুলির মধ্যে একটী হচ্ছে বৃন্দাবনে অন্যান্য মায়েদের ঘরে চোরের মত ঢোকা এবং মাখন খাওয়া—যা তারা অত্যন্ত যত্নসহকারে তৈরী করেছিল এবং খুব সাবধান করে লুকিয়ে রেখেছিল। কৃষ্ণের প্রতি গভীর বাৎসল্য প্রেমে বিভোর হয়ে এই মাখন তারা স্বহস্তে মন্থন করেছিল। আর এই মাখন চুরি করে এবং খেয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতি ব্রজবাসিগণের প্রেমের পরীক্ষা নিতেন এবং সেই সঙ্গে তাদের হৃদয়ও চুরি করতেন।

মাতা যশোমতী এই ভেবে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন যে, তাঁর বালক শিশু ধীরে ধীরে দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই দুষ্টু বালকে পরিণত হওয়ার থেকে নিবারণের জন্য মা স্থির করলেন—গোপালকে উদূখলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে শাস্তি দেবেন। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ—যিনি অসীম, অচিন্ত্যশক্তির অধিকারী, তিনি সাধারণ শিশুর ন্যায় বন্ধনদশা স্বীকার করতে সম্মত হলেন—সর্ব্বোত্তম সুমধুর বাৎসল্য রস ও ভাব আস্বাদন করার জন্য। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের ভক্তের প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক চিদ্বিজ্ঞানের দুর্ব্বোধ্য রহস্য। পরম পুরুষোত্তম হচ্ছেন সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর (নিয়ন্ত্রকেরও নিয়ন্ত্রক)। তথাপি তিনি প্রিয় ভক্তগণের প্রেমে বশীভূত হয়ে পড়েন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামি-মহারাজ-প্রদত্ত এই আকর্ষণীয় কাহিনী আমাদের নিকট ভগবানের দিব্য চিন্ময় রাজ্যের এক ঝলক আলোকের ন্যায়। যেখানে প্রতিটি কথা গানের মত, প্রতিটি পদক্ষেপ নৃত্যের মত, যেখানে কৃষ্ণ ও তাঁর নিত্য পরিকরেরা নব-নবায়মান লীলায় মগ্ন। ভগবান্ ও তাঁর নিত্য পার্ষদগণ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি প্রদান করুন—যাতে আমরা একদিন পরম পবিত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করে যুগলসেবায় অংশ গ্রহণ করতে পারি।

বর্ত্তমান সংস্করণ-প্রকাশে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীসুরেন্দ্র-গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারীর সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ সেবকগণকে উত্তরোত্তর সেবামোদ প্রদান করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের
আবির্ভাব-তিথি
৮ নারায়ণ, ৫২৩ শ্রীগৌরাব্দ
২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ (ইং ১০।১২।২০০৯)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপালেশপ্রার্থী—
শ্রীভক্তিবেদান্ত বৈখানস

বিষয়-সূচী

মাখন চোর

প্রথম অধ্যায়

কৃষ্ণের লীলা-স্মরণ

বৈদিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান

ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি দার্শনিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং এই জ্ঞান এমন এক স্তর পর্য্যন্ত বিকশিত হয়েছে, যেখানে মুনি-ঋষিগণ এই সংস্কৃতির মধ্যে আত্মাকে আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা অন্তরে ও বাহিরে ভগবানের সন্ধান পেয়েছেন এবং পরমতত্ত্বের উপর গভীর অনুসন্ধানপূর্ব্বক ভগবানের সহিত জীবের বিভিন্ন সম্পর্ক জানতে পেরেছেন এবং উপলব্ধিও করেছেন। আমরা আমাদের প্রাকৃত জড় ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় সম্বন্ধ কখনই কল্পনা বা অনুভব করতে পারব না।

যা হোক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সদ্‌গুরু ও শিষ্য-পরম্পরার এক অপ্রাকৃত ধারার মাধ্যমে এই চিন্ময় জ্ঞানকে জগতে প্রবাহিত করেছেন। তিনি এই অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রথমে লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে (জড় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা) প্রদান করেছিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা নারদমুনিকে, নারদমুনি শ্রীব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এই জ্ঞান প্রদান করেছেন। গুরুপরম্পরার এই ধারা চিন্ময় জ্ঞানের ভিত্তি (Body) স্থাপন করেছেন এবং ইহা সঠিক উৎস হতে আমাদের নিকট নেমে এসেছে। আমাদের এই পরম্পরার উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক একে অনুসরণ করার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত।

ভগবানের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য কি? তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তা ও অপ্রাকৃত করুণাকে কিভাবে আমরা জানতে পারব? তাঁর সঙ্গে আমাদের কি-প্রকারের সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্ক কিভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারব এবং তাঁর সেবায় নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত হতে পারব? অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেই এই

বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যাহা বৈদিক সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্বাদশস্কন্ধ-সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশগুলো দশমস্কন্ধেই বর্ণিত হয়েছে। বর্ত্তমান এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে দশমস্কন্ধের সারমর্ম্ম বর্ণনা করা। ইহা খুব আকর্ষণীয় এবং সর্ব্বসাধারণের পাঠের পক্ষে উপযোগী। ইহা আপনাদের ভক্তিযোগ অনুশীলনে সাহায্য করবে এবং প্রেমভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাবে।

ভক্তিযোগ

পরমতত্ত্বকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার জন্য আমাদের অবশ্যই ভক্তিযোগ অনুশীলন কর্ত্তব্য, অন্যথায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনই বুঝিতে পারব না। 'ভক্তি' কি?—জানতে হলে আমাদের প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, আত্মা ও পরমাত্মা নিত্য বর্ত্তমান। কৃষ্ণ নিত্য একক পরমাত্মা এবং আমাদের ন্যায় অসংখ্য স্বতন্ত্র জীবাত্মাও নিত্য।

কেবলমাত্র প্রেম ও অনুরাগের মাধ্যমে এই দুই পবিত্র আত্মা (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে পারে। এই অনুরাগ ও প্রেমকে ভক্তি বলে। অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেম ও অনুরাগের মধ্যে বহু বিভাগ রয়েছে। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠরাজ্যে মুক্ত জীবাত্মারা নিত্যকাল ধরে কৃষ্ণের সেবা করে চলেছেন। বৈকুণ্ঠ-মধ্যে গোলোক-বৃন্দাবন নামক কৃষ্ণের এক অপ্রাকৃত ধাম আছে। তথায় তিনি অপ্রাকৃত প্রেম ও মাধুর্য্যমণ্ডিত অনুরাগের দ্বারা সেবিত হচ্ছেন।

বদ্ধ জীবাত্মা প্রকৃতই আবদ্ধ এবং মায়াদ্বারা আবৃত। তারা পদার্থসমূহদ্বারা গঠিত এবং এই জড় শরীরের সেবা করার পক্ষে উপযুক্ত—আত্মার জন্য নহে। এই বদ্ধ জীবাত্মা সর্ব্বদা অসুখী, কেননা, তারা জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। কিভাবে তারা তাদের নিত্য অপ্রাকৃত-স্বরূপ এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক উপলব্ধি করবে? জীবনের প্রারম্ভ হতেই তাদের ভক্তিযোগ অভ্যাস (অনুশীলন) করতে হবে এবং বিশ্বাসের (দৃঢ়তার) সহিত নিয়মিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে প্রথমে দৃঢ় নিষ্ঠা (Steadiness), অতঃপর রুচির (Taste) জাগরণ হয়। রুচি হলেই ভগবানে আসক্তি (Attach-

ment) বৃদ্ধি পায়। আসক্তি তখন চিন্ময় পরমানন্দে (Transcendental ecstasy) পরিপক্কতা লাভ করে। অবশেষে এরূপে একজন পূর্ণ ভগবদ্ভক্তি-প্রেম (Pure love of Godhead) লাভ করেন। ইহাই ভক্তিযোগের ক্রমপন্থা।

ভগবানের অবতরণ

একমাত্র ভক্তিযোগের মাধ্যমেই আমরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি, অন্য কোন উপায়ের দ্বারা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবান্ এতই দয়ালু যে, এই জগতের বদ্ধ জীবের উপর কৃপা বর্ষণ করার জন্য তিনি স্বয়ং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতারের রূপ ধারণপূর্ব্বক অবতরণ করেন। ভগবানের আদিরূপ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ—যাঁহা হতে অন্যান্য অবতারসমূহ প্রকট হন। এই কারণে তিনি আদি ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্) নামে পরিচিত।

যখন কৃষ্ণ এই জগতে অবতরণ করেন, তিনি সর্ব্বজীব-আকর্ষণযোগ্য আদি চিন্ময়রূপে আবির্ভূত হন। মানুষের কি কথা, সমস্ত পশু-পাখী, হরিণ ও বৃক্ষাদির পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণ সকল প্রাণীকেই আকর্ষণ করেন, কেননা তিনি আত্মাকে আকর্ষণ করেন—যাহা সকল জীবের মধ্যে অবস্থিত ; এমনকি, জলকণা ও ধূলিকণার মধ্যেও। আত্মা সর্ব্বত্র অবস্থান করেন। যদি আপনি ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন, তাহলে এর বাস্তবতা যাচাই ও উপলব্ধি করতে পারবেন এবং আপনি ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বিকশিত করতে পারবেন।

সাধারণতঃ লোকজন বেশী দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করতে বা পড়তে পছন্দ করেন না। তজ্জন্য আমি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ বর্ণনা করত শুদ্ধ ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। এই ভক্তিযোগ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হবে, যদি আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করি—কিভাবে কৃষ্ণ এই জগতে অবতরণ করেন, কিভাবে তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন এবং কিভাবে তিনি সর্ব্বোত্তম মনোহর লীলাবিলাস করেন ইত্যাদি।

কৃষ্ণলীলা-শ্রবণের সৌভাগ্য ও সার্থকতা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম ও লীলা এই নশ্বর জগতের কোন পার্থিব

বস্তু নয়, তাঁহা চিন্ময়। তাঁহার লীলাকথা শ্রবণও সাধারণ প্রাকৃত কর্ম্মের অন্তর্গত নহে—তাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়।

জড়জগত ও চিন্ময় জগতের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। যখন আমরা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী ও লীলাসমূহ কীর্ত্তন করি অথবা তাঁর পবিত্র নাম জপ করি, তখন এইপ্রকার চিন্ময় শব্দতরঙ্গ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এমনকি যদি কেহ অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবে থাকে এবং তার হৃদয় সকলপ্রকার অনর্থে পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু যদি তার সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে এই চিন্ময় শব্দতরঙ্গ কর্ণরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে। সাধারণ অর্থে ইহা শব্দসামান্য নহে—কৃষ্ণ স্বয়ং চিন্ময় শব্দতরঙ্গরূপে জগতে এসেছেন। কিভাবে? সামান্যতম বিশ্বাস-শ্রদ্ধা যদি কাহারও মধ্যে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির হৃদয় অবশ্যই চিন্ময় জগতের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হবে। যাঁর উপলব্ধি হয়, তাঁর হৃদয় নির্ম্মল ও পবিত্র হয়ে যায় এবং বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়। অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি তাঁর হৃদয়ে প্রকাশ পায় এবং তিনি একজন ভক্তে পরিণত হন।

ভগবদ্ভক্তির এই পন্থা তখনই শুরু হয়—যখন শ্রীগুরুদেবের প্রতি ভক্তের বিশ্বাস জন্মায় এবং তাঁর নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখনই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে তাঁহার ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন (ভজন-ক্রিয়া) শুরু হয়। সর্ব্বপ্রকারের অনর্থ, জড় কামনা-বাসনা হৃদয় হতে দূরীভূত হয়, সকল প্রকারের কুস্বভাব (অনর্থ নিবৃত্তি) দূর হয়। ভগবদ্ভক্তির বিধি-বিধানগুলি সঠিকরূপে নিষ্ঠার সহিত অভ্যাস করে। এই নিষ্ঠা হতে ভগবদ্ভক্তিতে রুচি জন্মায়। রুচি পরবর্ত্তিকালে অপ্রাকৃত আসক্তিতে রূপান্তরিত বা বিকশিত হয়।

অতঃপর তাঁর ভগবদ্ভক্তি অপ্রাকৃত ভাবদশায় পৌঁছায়। ভাবদশা পরিপক্ক হলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত হয়। এমন এক সময় আসে যখন ভক্ত জড় মন, মিথ্যা অহঙ্কার ত্যাগ করত চিন্ময় স্থিতিতে উপনীত হন। তখন চিন্ময় শরীরে ভক্ত নিত্য ব্রজবাসিরূপে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করেন এবং চিরকালের জন্য সুখী হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা
ভূমিকা

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম নয়টী স্কন্ধসহ বৈদিক সাহিত্যসমূহ ভগবানের অসাধারণ লীলাসমূহ বর্ণন করেছেন—যা কোন মানুষের বা দেবতার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। এই লীলাগুলিই প্রতিপন্ন করে যে, তিনিই পরমতত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান্।

ভাগবতের দশমস্কন্ধ অত্যন্ত মধুর লীলাসমূহ প্রকাশ করে—যা ব্রজভূমিতে সংঘটিত হয়েছিল। তথায় স্বয়ং ভগবান্ সাধারণ মানবশিশুর ন্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভক্তগণ তাঁকে কখনও ভগবান্‌রূপে চিন্তা করেননি, পরন্তু তাঁকে এক মনোহর চিত্তহারী বালকরূপে দর্শন করেন। এই কারণেই তাঁরা অন্তরঙ্গ মমতায় ও প্রেমে তাঁর সেবা করতে পারেন। তাঁকে ভগবানরূপে চিন্তা করলেই ত' 'অন্তরঙ্গতা'দ্বারা সেবা সম্ভব নহে।

এই ব্রজলীলায় কৃষ্ণ অসহায় শিশুরূপে জন্মলীলা করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে বালক ও কৈশোরে উপনীত হন। যা হোক্, তিনি আমাদের ন্যায় জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বশীভূত নহেন। অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তগণকে আনন্দ প্রদানের জন্য তিনি এক সাধারণ বালকশিশুর ন্যায় অভিনয় করেন। তিনি সর্ব্বদা একই থাকেন—অপরিবর্ত্তনশীল, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরম পুরুষোত্তম ভগবান্। অপ্রাকৃত লীলাগুলিকে সংঘটিত করার জন্য তাঁরই লীলাশক্তি যোগমায়াদেবী তাঁর ভগবৎসত্ত্বাকে আবৃত করে রাখেন। এইভাবে তিনি ও তাঁর ভক্তগণ সম্পূর্ণরূপে অন্তরঙ্গ প্রেমময় রসলীলায় ডুবে থাকতে পারেন।

একই পরমতত্ত্বের দুইরূপে প্রকাশ

কৃষ্ণ ও বলরাম—উভয়েই পরমেশ্বর ভগবান্। প্রশ্ন হতে পারে, কিভাবে দুই ব্যক্তিসত্ত্বা একইসঙ্গে ভগবান্ হতে পারেন? আমাদের বুঝা উচিত যে, যদিও তাঁরা দুই শরীর প্রকাশ করেছেন তথাপিও বলদেব প্রভু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ হতে অভিন্ন। তাঁরা উভয়ে এক। কৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েছেন বলদেবের শরীরে।

এই অবতারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে পারা যায়, তাহা জীবকে শিক্ষা প্রদান করা ।

বলদেব প্রভু হচ্ছেন অখণ্ড গুরুতত্ত্ব। তিনি আমাদের অপ্রাকৃত জ্ঞানের মূলতত্ত্ব এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলসেবা শিক্ষা প্রদান করেন।

যখন পরমতত্ত্ব বয়োপ্রাপ্ত হন

আমরা—বদ্ধ জীবাত্মারা শিশুরূপে আমাদের জীবন শুরু করি। তারপর ক্রমে ক্রমে বালক, যুবক, প্রাপ্ত বয়স্কের মধ্য দিয়ে বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। কিন্তু কৃষ্ণের এবম্প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। চিন্ময়ধাম গোলোক-বৃন্দাবনে তিনি সর্ব্বদাই নিত্য কিশোর—তিনি কখনও ছোট বা বড় হন না। কিন্তু এই জড়জগতে যখন তিনি লীলাবিলাস করেন, তখন তিনি বয়োবৃদ্ধির পর্য্যায়ক্রম দেখান, যাতে ভজনের মাধ্যমে প্রেম ও অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের মন ও চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি নিবদ্ধ হয়।

কৃষ্ণ-বলরাম স্বয়ং ভগবান্ হওয়া সত্ত্বেও বাল্যলীলায় তাঁরা ব্রজে নগ্ন শিশু হয়ে খেলাধূলা করেছেন, হামাগুড়ি দিয়ে চলেছেন। কৃষ্ণের মাতা হলেন যশোদা ও বলরামের মাতা হলেন রোহিণীদেবী।

কখনও কখনও কৃষ্ণ-বলরাম সাপ দেখলেই খালি হাতে ধরতে যেতেন এবং রোহিণী ও যশোদা মাতা তা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেতেন। কখনও বা বালকেরা বন্য কুকুরের মুখে হাত ঢুকালে তারা শান্ত হয়ে যেত ।

তাঁরা এক বিশেষ ধরণের খেলা শিখেছিলেন। তাঁরা কুকুর বা বাছুরের লেজ শক্ত করে ধরতেন এবং তারা কৃষ্ণ-বলরামকে সারা উঠানে টেনে টেনে ঘুরাত। কখনও বা বিশাল ভয়ঙ্কর বৃষের শিং ধরে তাদের সহিত কুস্তি লড়তেন এবং বৃষরাও তাঁদের সঙ্গে প্রেমে খেলা করত।

যশোদার শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ

কৃষ্ণ-বলরাম তখন খুব বাচ্চা ছিলেন। তাঁরা মাঝে মাঝে ঘরের দরজার বাহিরে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যেতেন এবং বাহিরের অচেনা-অজানা কাকেও দেখলেই ভয়ে ভীত হয়ে মায়েদের স্মরণ করতেন এবং ছুটে পালিয়ে এসে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। মা যশোদা ও রোহিণী তখন তাঁদিগকে কোলে বসিয়ে কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে দিতেন এবং গায়ে-মাথায় হাত

বুলিয়ে আদর করতে করতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দ্রবীভূত হৃদয়ে কৃষ্ণ-বলদেবের মুখে নিজ নিজ স্তন প্রদান করতেন।

কখনও বা কোন প্রতিবেশী মা যশোদার বাড়ীতে এসে দেখতেন যে, মা যশোমতী কৃষ্ণের জন্য কিছু না কিছু করছেন—হয় দধিমন্থন, না হয় অন্যকিছু। তাঁর কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনরূপ কর্ম্ম ছিল না। যখনই তিনি সেবাকাজ করতেন, তখনই কৃষ্ণকে স্মরণপূর্ব্বক গান করতেন,—'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি'.............।

কৃষ্ণ-বলরাম সারা ঘর ও উঠানে হামাগুড়ি দিতেন। আর মা তাঁদিগকে রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা উঠান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেন। যখন তিনি উঠান পরিষ্কার করতেন, তখন তিনি গান গাইতেন,—'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি'.......।

যখন মা যশোদা উদূখলে মুষল দিয়া কিছু পেষণ করতেন, তখন কৃষ্ণলীলা স্মরণ করতে করতে গান গাইতেন,—'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি'.........।

কোনদিন গৃহের সকল দাস-দাসীগণকে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত করত নিজে বেদানার বীজ টিয়া, তোতা পাখীকে খেতে দিয়ে বলতেন,—তোরাও আমার মত গান কর—'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি'...............।

গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করবার সময় কেবল মা যশোদা কৃষ্ণকে স্মরণ করতেন তাহা নহে, ব্রজের সকল গোপীগণও তাঁর কথা চিন্তা করতেন। গৃহে কর্ম্মরত অবস্থায় গোপীগণ এই চিন্তা করে অপেক্ষা করতেন, 'কৃষ্ণ কখন আসবে ও মাখন চুরি করবে।'

তাঁরা চিন্তা করতেন 'কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আসবেন, মাখন চুরি করবেন এবং ছলচাতুরী যেমন করেই হোক, আমরা তাঁকে ধরে ফেলবই।'—এইরূপ মনোভাব নিয়ে ঘরের কাজকর্ম্ম করে ব্রজগোপীগণ সময় অতিবাহিত করতেন।

কখনও কখনও গৃহের সকল কর্ম্ম সমাপ্ত করে ব্রজগোপীগণ মা যশোদার বাড়ীর উঠানে এসে একত্রিত হতেন। কেন?—কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য। তিনি এতই সুন্দর ও মনোহর ছিলেন যে, গোপিকারা নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষা কৃষ্ণের জন্য অধিক স্নেহ ও মমতা অনুভব করতেন। তাঁরা মনে মনে এইরূপ বাসনা পোষণ করতেন যে, কৃষ্ণকে যেন আমরা আমাদের সন্তানরূপে লাভ করে আমাদের স্তনদুগ্ধ তাঁকে পান করাতে পারি এবং অধিক স্নেহ-মমতাদ্বারা তাঁর সেবা করতে পারি।

শিশু কুস্তিগীর

সকল গোপিকারা এবং গাভীগণও এইরূপ চিন্তা করত। কখনও বা গাভী এবং বাছুরেরা নন্দগ্রামে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। তখন কৃষ্ণ-বলরাম বাইরে এসে তাদের (শরীরের) নীচে শুয়ে পড়তেন এবং গাভীগণের স্তনভাণ্ড হতে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়ে তাঁদের মুখে পড়ত। গাভীগণ চিন্তা করত, যদি কৃষ্ণ আমাদের সন্তান হত, তাহলে আমরা তাঁকে স্নেহ করতে পারতাম এবং দুগ্ধ পান করাতাম। ব্রজের সর্ব্বত্রই সকলের এইপ্রকার মনোভাব ছিল।

কৃষ্ণ-বলরাম ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগলেন। এখন তাঁদের বয়স এক বছর ছয় মাস। তাঁরা দাঁড়াতে পারতেন, ধীরে ধীরে হাঁটতে পারতেন। মাঝে মাঝে পড়েও যেতেন। যে-সকল গোপীগণ তাঁদের দেখতে আসতেন, তাঁরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে কেহ কেহ কৃষ্ণের পক্ষ এবং কেহ কেহ বলরামের পক্ষ অবলম্বন করতেন। কৃষ্ণপক্ষীয়া গোপীগণ বলতেন,—'কৃষ্ণ খুব শক্তিশালী, ও বলরামকে পরাজিত করতে পারে।' বলদেব-পক্ষীয়া গোপীগণ বলতেন,—'না, না, বলরাম কৃষ্ণাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।' প্রথম সারির গোপীগণ বলতেন, —যদি কৃষ্ণ বলরামকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে আমরা কৃষ্ণকে লাড্ডু দেব।' দ্বিতীয়পক্ষ বলতেন,—'যদি বলরাম এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তাহলে আমরা তাঁকে লাড্ডু খাওয়াব।'

কৃষ্ণ-বলরাম গোপীগণের মনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর গোপীগণ পরস্পরের মধ্যে কুস্তি লড়াইয়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। উলঙ্গ অবস্থায় তাঁরা দুইজন পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াতেন এবং পেশাদার কুস্তিগীরের ন্যায় তাঁরা তাঁদের জঙ্ঘা, বক্ষস্থলে করাঘাত করতেন। অতঃপর পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে একে অপরকে মাটিতে ফেলবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা শক্তিতে প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। কখনও বা বলদেব প্রভু কৃষ্ণকে পরাজিত করবার মুখে, আবার কখনও বা কৃষ্ণ বলদেব প্রভুকে পরাজিত করবার মুখে। অবশেষে বলরাম কৃষ্ণকে পরাজিত করতেন। এইভাবে তাঁরা একবার সম্মুখে ও একবার পশ্চাতে করতেন। আর এই মজা দেখে হাততালি দিয়ে ব্রজগোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন।

প্রেমের অভিযোগ

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। তিনি কোমরে এক সোনার হার পরতেন। যখন তিনি হাঁটতেন তখন ঝন্‌ঝন্‌, টিং টিং আওয়াজ হত। তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতেন। এইরূপ মিষ্ট আওয়াজ কোথা হতে আসছে? তিনি এদিক্ ওদিক্ তাকাতেন, কিন্তু বুঝতে পারতেন না যে, তিনি স্বয়ংই এই ধ্বনি তৈরী করছেন।

গোপীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করতে আসতেন, কিন্তু তাঁরা এখানে এসে মা যশোদার নিকট পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতেন—কৃষ্ণ মাঝে মাঝে আমাদের ঘরে এসে মাখন চুরি করে। বিভিন্নস্থানে লুকিয়ে রাখলেও সে ঠিক খুঁজে বার করে। তার সঙ্গে বহু সখা রয়েছে—সুদাম, শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি। তারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণের সঙ্গে থাকে। তারা দুষ্ট বানরের ন্যায়। কৃষ্ণের শিশু সখাগণ ছিল উলঙ্গ, তারা তার নিত্য সঙ্গী ছিল।

যখন গোপীগণ মা যশোদার নিকট গোপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসতেন, তখন কিন্তু তাঁরা কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করতেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা যশোদার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। তারা মনে মনে চিন্তা করতেন, যশোদা আমাদের ন্যায় সৌভাগ্যবতী নহেন। কৃষ্ণ আমাদের বাড়ীতে আসে, এখানে-সেখানে খেলা করে, তার নিজের ইচ্ছামত মাখন, ননী ইত্যাদি চুরি করে ; কিন্তু নিজের বাড়ীর কোন জিনিসে হাত দেয় না এবং এত সুমধুর খেলাও খেলে না। সুতরাং আমরা যেমন ভাগ্যবতী, যশোদা তেমন নয়। কেননা, যশোদা এইরূপ মধুর লীলা দর্শন করতে পারেন না। সুতরাং আমরা ধন্য। দেখলে মনে হয়, তাঁরা যেন অভিযোগ নিয়ে মা যশোদার নিকট এসেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অভিযোগ করবার ভাণ করতেন। আসলে এই লীলা-গুলো বলে তাঁরা কৃষ্ণকেই স্মরণ করতেন এবং অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতেন। তাঁরা মা যশোদাকে জানাতেন—তাঁর অপ্রাকৃত এই পুত্র কতই না সুন্দর, মনোহর ও চিত্তহারী।

বর্ত্তমানে এইরূপ কিছু লীলা এইস্থলে বর্ণনা করা হচ্ছে—যা যশোদার সখীরা তাঁকে বলছে,—"অহো! তোমার পুত্র অতীব দুষ্ট হয়েছে। সে আমাদের ঘরে ঢুকে দুরন্তপনা করছে। আমাদের মাখন চুরি করে তার বন্ধুগণকে খাওয়ায় ও বানরগুলোকে দেয়।"

কখনও বা তিনি অত্যন্ত চুতর মতলব আঁটেন। তিনি কোন এক সখাকে বলেন, —'তুই তোর মাকে গিয়া বলিস্, 'মা, তাড়াতাড়ি এস, কে আমাদের বাছুরের দড়ি খুলে দিয়েছে, আর বাছুর গিয়ে দুধ খেয়ে নিচ্ছে, পরে দুধ দোহনের জন্য আর কিছুই থাকবে না। আর আমরা বাড়ীর পিছনে বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকব।'

যখন বালক তার মাকে গিয়ে এই খবর দিত, তখন গোপীমাতা বাছুরের পিছনে ছুটে যেত, আর তখনই কৃষ্ণ তাঁর সাখাদের নিয়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করে মাখন চুরি করতেন এবং অন্যান্য যা কিছু পেতেন, তাও নিয়ে পালাতেন।

কোন গোপী নিজের ঘরে লুকিয়ে ভাবতেন, 'আজ কৃষ্ণ নিশ্চয় আমার ঘরে আসবে, তখন আমি তাকে ধরে ফেলব।' সত্য-সত্যই ঐ ঘরে কৃষ্ণ ঢুকতেন এবং যেই মুহূর্ত্তে মাখনের হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকাত, সেই সময় গোপী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর হাত ধরে ফেলতেন এবং বকাবকি করতেন—এই, তুই আমার ঘরে মাখন চুরি করছিস্?

কৃষ্ণ উত্তর দিতেন,—'ওহে মাতা! আমি ভেবেছি এটা আমার ঘর আর তুমি আমার মা। আমি কখনই ভাবতে পারি না যে তুমি আমার মা নও এবং কখনও কল্পনা করতে পারি না যে তুমি আমাকে ধরে বেঁধে মারবে!' এই বলেই কৃষ্ণ হেসে দিতেন। কৃষ্ণের হাসি দেখে তখন গোপীর হৃদয় গলে যেত এবং তাঁর হাত শিথিল হয়ে যেত। সেই সুযোগে কৃষ্ণ গোপীর হাত মুড়ে দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতেন।

পলায়মান বাছুর

একদিন এক গোপী যশোদা মায়ের নিকট এসে বলছেন,—'আজ আমি সত্য সত্যই মাখনের হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকানো অবস্থায় তোমার ছেলেকে ধরে ফেলেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেন এখানে এসেছ? মাখন চুরি করতে?

তদুত্তরে কৃষ্ণ বলল,—'না, না, মা, আমি আমার বাছুরকে খুঁজছি। আমি তার সঙ্গে আজ খেলছিলাম। হঠাৎ সে দৌড়ে পালিয়ে এল। আমি তাকে ধরার জন্য তার পিছনে পিছনে দৌড়ালাম। কিন্তু সে এই পাত্রের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে।'

'কি! তোমার বাছুর এই মাখন-পাত্রের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, সত্যি?'

'হ্যা মা, তোমার ছেলে অনায়াসেই উত্তর দিল এবং সে মাখনের হাঁড়ি থেকে হাত বের করল। তখন তার হাতে ছিল মার্ব্বলের তৈরী এক বাছুর। তখন সে ও তার সাখারা উচ্চস্বরে হাসতে লাগল এবং সেখান থেকে পালিয়ে গেল।'

কৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান্। তিনি সর্ব্বদাই তাঁর ভক্তদেরকে আনন্দ প্রদান করতে চান। কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগণ তাঁর মত নহেন। সকলেই কৃষ্ণের আরাধনা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর ভক্তদের আরাধনা করেন, সেবা করেন এবং তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। ব্রজে কৃষ্ণের শুদ্ধভক্তরা চিন্তা করেন, 'আমি চাই কৃষ্ণ আমার ঘরে আসুক, মাখন চুরি করুক।' আর এই কারণেই কৃষ্ণ মাখন চুরি করতে আসেন। অন্যথায় কৃষ্ণের অন্যের ঘরে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না।

কৃষ্ণ কেবল ভক্তি ও প্রেম গ্রহণ করেন

কেবল ভক্তি ও প্রেমদ্বারা নিবেদিত কোন উপহার কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। এইরকম এক উদাহরণ এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে—যা পরবর্ত্তিকালে হস্তিনাপুরে ঘটেছিল।

সকলেই জানে যে অর্জ্জুন ও তার চার ভাই কৃষ্ণের সখা ও বিশেষ অনুরাগী ভক্ত। হস্তিনাপুরে বসবাসকারী দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের পরম শত্রু ছিল, (পরবর্ত্তিকালে তারা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল) কিন্তু সেই দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে ইচ্ছা করেছিল। দুর্য্যোধন প্রচুর সম্পদ্শালী ছিল। লাড্ডু, পেঁড়া, সন্দেশ, মাখন প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করে সোনার থালায় সাজিয়ে দিয়েছিল, জল দিয়েছিল সোনার গ্লাসে। তারপর কৃষ্ণকে অনুরোধ জানাল,—'দয়া করে আসুন এবং আমার সঙ্গে ভোজন করুন।'

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—'আমি খেতে পারি না, কারণ আমার ক্ষুধা নেই। যেখানে প্রেম ও ভক্তি আছে, সেখানেই আমি যাই ও খাই। আমার প্রতি বিন্দুমাত্র তোমার মমতা ও ভালবাসা নেই। তাই তোমার সঙ্গে আমার ভোজন চলে না। আমি হস্তিনাপুরে এসেছিলাম তোমাকে বলতে যে, অর্জ্জুন ও তার ভাইদের সঙ্গে সন্ধি কর, কিন্তু তুমি সে কথায় কর্ণপাত কর নাই। অতএব কিভাবে আমি তোমার সঙ্গে একসাথে ভোজন করতে পারি। আমি ভিক্ষুক নই, ক্ষুধার্ত্তও নই।'

সুস্বাদু কলার খোসা

দুর্য্যোধন-প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ সরাসরি বিদুরের গৃহে চলে এলেন। বিদুর ছিলেন কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। প্রকৃতপক্ষে বড় বড় ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে বহুবার তাঁদিগকে রক্ষা করেছিলেন।

এই কারণে বিদুর কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। যখন কৃষ্ণ বিদুরের কুটিরে যান, তখন বিদুর গৃহে ছিলেন না। কৃষ্ণ সরাসরি বিদুরাণীকে বললেন,—'হে বিদুরাণী মা! আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দাও।' বিদুরাণীও কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং সেবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁকে কলা খেতে দিলেন। কিন্তু ভাবাবেশে কলা ছাড়িয়ে কলা না দিয়ে কলার খোসা খেতে দিতে লাগলেন। আর কৃষ্ণ মনের আনন্দে তা খেতে লাগলেন। দ্বারকার রুক্মিনী-সত্যভামাদি মহিষীগণের তৈরী করা সুস্বাদু খাবারের চেয়ে বিদুরাণী-প্রদত্ত কলার খোসা অত্যন্ত সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ছিল, কারণ তা ছিল ভক্তের ভক্তি ও প্রেম-মিশ্রিত।

যখন কৃষ্ণ অতীব আনন্দে মগ্ন হয়ে বিদুরাণী-প্রদত্ত ভক্তিপ্লুত উপহার (কলার খোসা) আস্বাদন করছিলেন, তখন বিদুর ঘরে প্রবেশ করে তা দেখেই হতচকিত হয়ে গেলেন এবং বললেন,—'ওগো, তুমি এ কি করছ?'

কৃষ্ণ তাঁকে সাবধান করে বললেন,—"চুপ, ওর সঙ্গে কথা বলো না। সে এখন বাহ্যিক জ্ঞানরহিত হয়ে অপ্রাকৃত চিন্ময় রস আস্বাদন করছে।" কিন্তু বিদুরের কণ্ঠস্বর গোচরীভূত হতেই তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, তিনি কি মহা ভুল করেছেন। লজ্জায় অধোবদনে কৃষ্ণের হাতে কলা দিলেন আর খোসাগুলো ফেলে দিলেন।

সামান্য হতাশ হয়ে কৃষ্ণ বললেন,—"আরে, কলাগুলো খোসার ন্যায় অত সুস্বাদু নয়।"

এই লীলা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, কৃষ্ণ কখনও ক্ষুধার্ত্ত হন না। তিনি কখনও কলা, মিষ্টি বা কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য চান না। তিনি কেবল সমস্ত ফলের সার গ্রহণ করেন।

এই সার বস্তুটা কি? প্রেম ও ভক্তি—সেবা করার মানসিকতা। যার অন্তরে কোন প্রেম-ভক্তি নেই, তার নিকট থেকে কৃষ্ণ কিছুই গ্রহণ করেন না। পক্ষান্তরে,

যিনি তাঁকে ভালবাসেন, ভক্তি করেন, তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্ব্বক সবকিছু কেড়ে নেন—যদি ঐ ভক্ত উপযুক্ত পরিমাণে সমর্পণ না করেন।

যখন এই কৃষ্ণ ভক্তভাব নিয়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রিয়ভক্ত শ্রীধরের সঙ্গে কলহ করতেন এবং তাঁর দোকান থেকে থোড়, মোচা, কলা প্রভৃতি জোরপূর্ব্বক কেড়ে কেড়ে নিতেন।

শ্রীধর প্রতিবাদ করে বলতেন,—"না, না, বিনামূল্যে আমি তোমাকে কিছুই দেব না। আমি খুব গরীব, তোমার এইভাবে দ্রব্যগুলো নেওয়া উচিত নয়। এখানে থেকে যাও এবং অন্য কারোর কাছ থেকে নাও।"

কিন্তু মহাপ্রভু কথা শুনতেন না, জোর করে থোড়, মোচা, কলাদি নিতেন। এটি হচ্ছে কৃষ্ণের স্বভাব। কৃষ্ণ ভিখারী নন। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, তথাপিও তিনি ব্রজে এসে তাঁর নিত্যসঙ্গিগণের সেবা করেন এবং তাদের সঙ্গে বিলাস করেন।

সমর্পিত কৃষ্ণ

এখন কৃষ্ণ একটু বড় হয়েছেন। একদা মাতা যশোমতী গোপালকে ডেকে বললেন,—"আজ তোমার জন্মদিন। যাও, এক বক্না বাছুরকে এখানে নিয়ে এসে পূজা কর।"

ইহা শুনে কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ঘরের বাহিরে গিয়ে এক বকনা বাছুরকে পছন্দ করলেন। সে রাজহংসের ন্যায় সাদা, খুব স্বাস্থ্যবান্, বলশালী ও নির্ভীক এবং এখানে-সেখানে লাফাচ্ছিল। কৃষ্ণ তাকে ধরার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। কিছু সময় পরে অবশ্য তাকে আয়ত্বে আনলেন এবং বাড়ীর উঠানে আনতে মনস্থ করলেন। কৃষ্ণ বাছুরের চার পা বাঁধতে সঙ্কল্প নিলেন, কিন্তু বাছুরকে কিছুতেই বাঁধতে পারছিলেন না। উভয়ের মধ্যে রীতিমত মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অবশেষে বহু চেষ্টা করে বাছুরকে উঠানে নিয়ে এলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল শিকা থেকে পাত্র ঝুলছে, তিনি বুঝতে পারলেন এর মধ্যে রাখা আছে সদ্যোজাত নবনীত।

তাঁর উদগ্র লালসা তাঁকে ভুলিয়ে দিল যে তাঁকে বাছুরটাকে ভেতরে আনতে হবে। কিন্তু এখন সমস্যা মাখন পাড়বে কি করে? এটি খুব উঁচু ছাদের আড়কাঠ হতে ঝুলছিল এবং সেখানে কোন সিড়ি বা দাঁড়ানোর উপায় ছিল না।

যখন তিনি বন্ধুদের সঙ্গে থাকেন, তখন তিনি একে অপরের পিঠে চড়ে মাখন পাড়তেন। কিন্তু এখানে না কোন বন্ধু ছিল, না কোন লাঠি, তাহলে উপায়?

খুব বিবেচনার সঙ্গে ভেবে কৃষ্ণ এক উপায় বের করলেন, 'যদি আমি বাছুরের পিঠের উপর দাঁড়াই, তাহলে অতি সহজেই মাখন পাড়তে পারব। তিনি বাছুরের পিঠে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং অতি সহজেই মাখনের হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। ঠিক ঐ মুহূর্ত্তে বাছুরটা লাফিয়ে দৌড়ে পালাল। আর বেচারা গোপাল হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকানো অবস্থায় ঝুলে রইলেন। ভয়ে চিৎকার শুরু করলেন 'মা, মা' বলে এবং উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন শুরু করলেন।

মা যশোদা তখন মাখন তুলছিলেন। গোপালের ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেয়ে তিনি ছুটে এলেন এবং পরিস্থিতি দর্শন করে বুঝতে পারলেন কৃষ্ণ কি করেছে।

তিনি বললেন—"তুই এইভাবে থাক্। তোকে আমি স্পর্শ পর্য্যন্ত করব না এবং এই দুষ্টামির জন্য উপযুক্ত শাস্তিও দেব। আমি কখনই তোকে সাহায্য করব না।"

কৃষ্ণ 'মা, মা' বলে আরও জোরে জোরে ক্রন্দন শুরু করলেন। একটু পরে অবশ্য মা যশোদা নামিয়ে দিলেন। এই কৃষ্ণ বাল্যকালে মনোহর দুষ্টামিতে ভরা ছিলেন এবং এই কারণেই সমস্ত গোপীগণের নিকট হতে, বিশেষ করে মায়ের কাছ থেকে অপরিসীম ভালবাসা ও স্নেহ লাভ করেছিলেন।

হাতে-নাতে ধরা

একদিন যশোদার এক সখী কৃষ্ণের দুষ্টামি সম্বন্ধে তাঁকে এক গল্প বললেন,—"একদিন গোপাল খুব সকালে মাখন চুরি করতে আমার ঘরে গিয়েছিল। কিন্তু আমি অতি যত্নে এমনভাবে সুরক্ষিত করে মাখন রেখেছিলাম যে তা তার নাগালের বাহিরে ছিল। এদিকে আমার ছোট ছেলেটা ঘুমিয়েছিল। কৃষ্ণ তাকে এমন চিমটি কাটল যে সে জেগে উঠেই কান্না শুরু করল। যদি বাড়ীতে তার চুরি করার জন্য মাখন না রাখি, তাহলে সে এইরকম ভয়াবহ উৎপাত করে এবং মাখন যদি বা পায়, কিন্তু তার পছন্দমত না হলে, পাত্রগুলো ভেঙে ফেলে।"

এই গল্প শুনে মা যশোদা চিন্তা করলেন,—"আমার মনে হয় কৃষ্ণ খুব

স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। অপরের ঘরে মাখন চুরি করে খায়। একদিন একে ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে।"

ইতিমধ্যে যশোদার সখী চিন্তা করলেন,—"আমি ওর পুত্রের সম্বন্ধে যা বলেছি হয়তো যশোদা বিশ্বাস করেনি। আমি গৃহে কৃষ্ণের আসার জন্য প্রতীক্ষা করব এবং হাতে-নাতে ধরে যশোদার নিকট নিয়ে যাব। তাহলে যশোদা বুঝতে পারবে যে তার ছেলে কত দুরন্ত ও দুষ্ট হয়েছে।

একদা খুব প্রত্যুষে, তখনও অন্ধকার ছিল, কৃষ্ণ একাকী ঐ গোপীর বাড়ীতে গেলেন। এখানে-সেখানে চুরি করছিলেন এবং মনে মনে ভাবছিলেন, কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। ঐ গোপী কিন্তু লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তাঁকে ধরার জন্য। কৃষ্ণ চুপিসারে এসে যেই না মাখন-হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়েছেন, অমনি গোপী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। তাঁর হাতে-মুখে মাখন লেগে ছিল। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন,—"আমি তোমাকে এই অবস্থায় যশোমতী মায়ের নিকট নিয়ে যাব। তাহলে তিনি বিশ্বাস করবেন যে, তাঁর ছেলে কত বড় চোর!"

গোপালের গায়ে একটী শাল জড়িয়ে বন্দীর ন্যায় যশোদার নিকট নিয়ে গেল। যশোদার ঘরের নিকট পৌঁছে চিৎকার করে ডাকলেন—"ও যশোদা, ও যশোদা, দেখ, সাতসকালেই তোমার ছেলে মাখন চুরি করছিল। একেবারে হাতে-নাতে ধরে বেঁধে এনেছি। এবার তোমার বিশ্বাস হল ত' যে তোমার ছেলে কত বড় পাকা চোর হয়েছে।"

মা অন্দরমহল থেকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। মা দেখলেন, তখনও কৃষ্ণ বিছানায় শুয়ে আছে। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যশোদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় আমার ছেলে?" উত্তরে ঐ গোপী কৃষ্ণের মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিয়ে বলল,—'এই দেখ।' অহো! তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে ছেলেটি কৃষ্ণ ছিল না। পরন্তু নিজের ছেলেকে বন্দী বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। এ কেমন করে সম্ভব হল? কৃষ্ণ শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলতে লাগলেন,—"মা, মা, দেখ, এরা সর্ব্বদা আমার নামে তোমার কাছে মিথ্যা নালিশ করে। আমি কখনই এর বাড়ী যাই নি, আর ও আমার নামে তোমার কাছে নালিশ করছে। এরা সকলেই মিথ্যেবাদী। এখন থেকে সত্যি-সত্যিই ওদের ঘরে গিয়ে মাখন চুরি করব।"

তৃতীয় অধ্যায়

প্রেমের বন্ধন

মাতা যশোদার সৌন্দর্য্য

একদিন মাতা যশোদা গৃহস্থালীর টুকিটাকি কাজকর্ম্ম করতে করতে আশ্চর্য্য হয়ে চিন্তা করছিলেন যে কিভাবে কৃষ্ণের মাখন খাওয়ার লালসাকে পরিতৃপ্ত করা যায়। সব গোপী কৃষ্ণকে খাওয়ানোর জন্য প্রেম ও ভক্তি দিয়ে আপন আপন হাতে মাখন তৈরী করে। তিনি চিন্তা করলেন, তাদের মাখন অত্যন্ত সুস্বাদু। আমি এখনও পর্য্যন্ত নিজের হাতে মাখন বানাইনি। আমার দাস-দাসীরা এ কাজ করে। এখন থেকে আমি নিজের হাতে গাভী দোহন করব, দুধ জ্বাল দেব এবং তা থেকে সুমিষ্ট দই বানাব। অবশেষে স্বয়ং দধি মন্থন করে সুস্বাদু ও সুমিষ্ট মাখন তুলব এবং সানন্দে কৃষ্ণ তা গ্রহণ করবে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে দীপাবলীর দিন সব দাস-দাসীকে নন্দবাবার বড় ভাই উপানন্দের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। এমনকি, বলরামের সঙ্গে রোহিণীমাতাকেও পাঠিয়ে দিলেন, কেননা, ঐদিন রোহিণীর প্রাসাদে দীপাবলীর প্রস্তুতির জন্য কোন কাজের লোক ছিল না। প্রত্যুষে অনুত্তেজিত ও প্রশান্ত সকালে ঈষৎ লালাভ সূর্য্য পূর্ব্ব গগনে উঠেছিল। একাকী যশোদা দধি মন্থন করছিলেন। তিনি দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। যদি তিনি সুন্দর না হবেন, তবে কৃষ্ণ কি করে সুন্দর হবেন? মা সুন্দর না হলে পুত্রও সুন্দর হতে পারে না।

কেমন করে আমরা মা যশোদার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করব? তাঁর বক্ষঃস্থল এতই প্রশস্ত ছিল যে, যদি তিনি কোমর নোয়ান, তবে মনে হয় যেন তা ভেঙে পড়বে। তিনি সূক্ষ্ম শিল্কের শাড়ী পরেছিলেন। ঐ সময় ভারতবর্ষে শিল্কের কাপড়ের শিল্প খুব উন্নত ছিল। এক মহিলার প্রমাণ মাপের শাড়ীর পরিমাপ প্রায় দশ (১০) গজ। তাঁতীরা এত দক্ষ ছিল এবং কাপড় এত সূক্ষ্ম ছিল যে, একটী এক অঙ্গুলিবিশিষ্ট নালের মধ্যে অতি সহজে সম্পূর্ণ শাড়ী ঢুকে যেতে পারে। দেওয়ালী উৎসব উপলক্ষে যশোদা এমন এক বিশেষ প্রকারের শিল্কের শাড়ী পরিধান করেছিলেন যার মধ্য থেকে তাঁর নারীসুলভ সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

মাতা যশোদা থামের (Piller) পাশেই দধির হাঁড়িটা রেখে মন্থনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং হাঁড়ির মধ্যে মন্থনদণ্ডটা রেখে সরু দড়ির সাহায্যে দণ্ডটাকে থামের সঙ্গে আটকেছিলেন। এখন দড়ির শেষপ্রান্ত টেনে মন্থন করতে শুরু করলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী, দক্ষ ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। এই কারণে কৃষ্ণও অত্যন্ত সুন্দর, মনোহর ছিলেন। হাজার হাজার লোক যদি তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস দর্শন করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

এইভাবে মা যশোদা যখন দধি মন্থন করছিলেন, তখন তাঁর মনোভাব কেমন ছিল? তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাগুলি স্মরণ করে কীর্ত্তন করছিলেন,—"গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি.......।" কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে যশোদা গানে এমন আবিষ্ট ছিলেন যে তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল। চোখ ছিল মুদ্রিত এবং প্রেমাশ্রুধারা গণ্ডদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

যশোদার গান

বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণের মহিমা গান করেন, তখন তাঁরা মৃদঙ্গ (খোল)-করতাল সহযোগে কীর্ত্তন করেন। মৃদঙ্গ 'ধিক্ তান্ ধিক্ তান্'-শব্দে প্রতিধ্বনি করে এবং গায়কের হাতের করতালও একই সুরে সুন্দর ধ্বনি করে।

মা যশোদা যখন দধিমন্থন ও কীর্ত্তন করছিলেন, তখন দধিভাণ্ডের তলদেশে মন্থনদণ্ডের ছন্দোময় তাল ঢাকের (Drum) ন্যায় 'ধিক্ তান্ ধিক্ তান্'-শব্দে এক সুন্দর ধ্বনি সৃষ্টি করছিল। ঐ সময়ে তাঁর গলার সোনার হার এবং হাতের কঙ্কন করতালের মত একই সুন্দর সুরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। কঙ্কনধ্বনি ও মন্থনদণ্ডের তালে তালে মা যশোদা গানও করতেন। মন্থনের 'ধিক্ তান্ ধিক্ তান্' শব্দ এই বলে গান করছিল,—'ধিক্! ধিক্! যারা কৃষ্ণের আরাধনা করে না এবং তাঁর স্মরণ করে না, তাদের জীবনকে ধিক্! তাদেরকেও ধিক্! ধিক্ তান্, ধিক্ তান্।'

কৃষ্ণের যশোদানুসন্ধান

যশোদা সম্পূর্ণরূপে তদ্গতচিত্ত ছিলেন। কৃষ্ণ শয্যা থেকে জেগে উঠলেন যেখানে তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়েছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় তখনও বন্ধ ছিল,

কিন্তু হাত দিয়ে তিনি মাকে অনুসন্ধান করলেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মা, মা, করে কাঁদলেন। যখন দেখলেন যে তাঁর মা সেখানে নেই, তখন তিনি একটু উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন শুরু করলেন এবং ছোট মুষ্টি দিয়ে ঘুমন্ত চোখ দুটো রগড়াতে লাগলেন। প্রথমে চোখে কোন অশ্রুধারা ছিল না। পূর্ব্বরাত্রে তাঁর মাতা পদ্মফুলের পাপড়ির মত বড় বড় চোখে যে কাজল লাগিয়েছিলেন, পরে চোখের জলে তা সারা মুখে লেপটাতে লাগল।

কৃষ্ণ যখন তাঁর মাকে দেখতে পেলেন না, তখন তিনি কান্না শুরু করেছিলেন, আমি সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, ক্ষুধার্ত্ত; কিন্তু আমাকে ছেড়ে মা অন্যত্র চলে গেছেন। অন্যান্য বালকেরা তাদের মাকে খুঁজতে গিয়ে যেমন কান্নাকাটি করে, কৃষ্ণও তেমন করে কাঁদছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি দধিমন্থনের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মা তাঁর শব্দ শুনতে পাবেন না, কারণ 'ধিক্ তান্ ধিক্ তান্' শব্দে তিনি দধিমন্থন করছিলেন এবং কীর্ত্তন করছিলেন 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি......।'

তখন গোপাল আরও জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। তথাপিও মা এলেন না। তারপর তিনি পালঙ্ক থেকে নীচে নামার বাসনা করলেন। কিন্তু সেটা এত উঁচু ছিল যে, তার থেকে কি করে তিনি নীচে নামবেন? পুরুষোত্তম ভগবানের অনন্ত রূপ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরে। কিন্তু একটী ছোট শিশুরূপে অভিনয় করতে গিয়ে তিনি বিছানা হতে নামতে পারলেন না। কৃষ্ণ প্রথমে উপুড় হয়ে শুয়ে পা দুটো নীচে নামিয়ে অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পদযুগল মাটি স্পর্শ করে এবং তারপর মায়ের নিকট যেতে শুরু করলেন।

স্খলিত চরণে টল্‌মল্ করতে করতে তিনি পা ফেলছিলেন, কারণ তখনও তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন এবং চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বহিতেছিল। তাঁর চোখের জল ছিল গঙ্গাজলের ন্যায় সাদা এবং যমুনার কাল জলধারার মত কাজলের প্রলেপ আঁকাবাঁকা সরু দাগের মত হয়ে গলদেশ দিয়ে বহিতেছিল। এখন তিনি আরও জোরে জোরে কাঁদছেন, কিন্তু তদ্গতচিত্ত মাতা যশোদা কীর্ত্তন ও মন্থনকার্য্যে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে, গোপালের ডাক তাঁর কর্ণগোচর হচ্ছিল না।

অবশেষে শিশু কৃষ্ণ মায়ের নিকট এলেন। এসেই বাঁ হাত দিয়ে মন্থনদণ্ড এবং ডান হাতে মায়ের শাড়ীর আঁচল টেনে ধরলেন। ভাবাবিষ্ট যশোদা আশ্চর্য্যান্বিত হলেন, আরে আমার মন্থনদণ্ড কে থামিয়ে দিল! তাকিয়ে দেখলেন শিশু কৃষ্ণ!

ওঃ! কৃষ্ণ এসে গেছে এবং সে কাঁদছে।

যশোদা মন্থনকার্য্য বন্ধ করে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন। তখনও তিনি কাঁদছিলেন দেখে মা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। কান্না থেকে নিবৃত্ত করে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্তনদুগ্ধ পান করালেন।

উন্মত্ত (বেপরোয়া) দুধ

এখন কৃষ্ণ কান্না থামালেন, কিন্তু যশোদা চোখের জল ফেলতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল এবং অপ্রাকৃত প্রেমের আবেগে তাঁর চুল খাড়া হয়ে গেল। প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণের ক্ষেত্রে যে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার লক্ষ্যীভূত হয়, মা যশোদার ক্ষেত্রেও তৎকালে তদ্রূপ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা গেল।

অবিরল ধারায় অশ্রুবারি ঝরতে লাগল, শরীর কাঁপতে শুরু করল এবং ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত মাতৃস্নেহ অনুভব করত সম্পূর্ণরূপে ভাবাবিষ্ট হলেন এবং কৃষ্ণ তা উপভোগ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পান করেও তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি, কেননা বহুক্ষণ তিনি ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে মা যশোদা দেখলেন যে, যে দুধ পাত্রে করে চুল্লীর আগুনে গরম করতে দিয়েছিলেন, তা উথলে পড়ে যাচ্ছে। যশোদা অনুভব করলেন যে, এই দুধ নিশ্চয়ই ভক্ত, সে (দুধ) চিন্তা করেছিল "আমি কৃষ্ণের সেবা করতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণের পেট এত বড় যে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এর পেটের মধ্যে ঢুকতে পারে। লক্ষ লক্ষ সমুদ্র তৈরী হতে পারে এমন দুধ মা যশোদার বক্ষঃস্থলে রয়েছে। কৃষ্ণের ক্ষুধা যেমন অসীম, যশোদার বক্ষেও তেমনই অনন্ত দুধের ভাণ্ডার রয়েছে। যদি কৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মায়ের স্তনদুগ্ধ পান করেন, তাহলেও তাহা কখনও শেষ হবে না। দুঃখের বিষয়, এই জীবনে আর কৃষ্ণের

সেবা করার সুযোগ পাব না। সুতরাং এ জীবন ধারণ করে কি লাভ? এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।"—এই চিন্তা করে দুধ আগুনে উথলে পড়ে যাচ্ছিল।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যগণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন

ভগবদ্ভক্তগণ বিনয়ী এবং নম্র হন—ইহা ভক্তির এক বিশেষ লক্ষণ। তাঁরা নিজেকে কৃষ্ণসেবার অযোগ্য মনে করেন। তাঁরা চিন্তা করেন—"আমাদের শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়গুলো কৃষ্ণসেবায় লাগছে না, অতএব আমাদের জীবনের কি দাম আছে?"

ভক্তের ন্যায় আমরা কখনও এইরূপ চিন্তা করি না, কারণ ভগবদ্ভক্তির পন্থাগুলি আমরা ঠিকমত অনুশীলন করি না। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সময় যদি কারও মনে এইরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, তাহলে কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে সেবার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন অথবা যশোদার ন্যায় কোনও এক ভক্ত এসে কৃষ্ণসেবার সুযোগ লাভ করিয়ে দেন।

যখন যশোদা বুঝতে পারলেন যে, দুধ হতাশাগ্রস্ত হয়ে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, তখন তিনি বললেন,—"ঠিক আছে, আমি তোমাকে আগে কৃষ্ণসেবার সুযোগ দিচ্ছি, আমি সেবা করব পরে।" একজন প্রকৃত ভক্ত—শ্রীগুরুদেব নূতন নূতন ভক্তগণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হচ্ছে—যোগ্য ব্যক্তিগণকে—যাঁরা সাধন-ভজনে আগ্রহী, তাঁদেরকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করা।

যশোদা কৃষ্ণকে পরাজিত করলেন

কৃষ্ণের জন্মের পরে পরেই, যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয়দিন, তখন পূতনা রাক্ষসী বৃন্দাবনে এসেছিল কৃষ্ণকে মারার জন্য। সে এক অপরূপ সুন্দরী রূপবতী রমণীর রূপ ধারণ করে স্তনে কালকূট বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল। যখন সে শিশু কৃষ্ণকে কোলে করে স্তনদুগ্ধ পান করাতে লাগল, তখন কৃষ্ণ দুধের সহিত তার প্রাণটাকে হরণ করতে লাগলেন। এই রাক্ষসীর শরীরে হাজার হাজার হাতীর বল ছিল। সে কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থল থেকে টেনে ফেলে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণের বদ্ধমুষ্টি হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। অবশেষে মারা গেল।

এখন কৃষ্ণের বয়স বেড়েছে এবং শক্তিশালীও হয়েছেন। যখন তিনি দেখলেন যে, মা তাঁর কোল থেকে তাঁকে নীচে নামানোর চেষ্টা করছেন, তখন শিশু বানরের ন্যায় কৃষ্ণ মাকে জোর করে আঁকড়ে ধরতে লাগলেন। হাত-পা দিয়ে মায়ের শরীরের চারপাশ শক্ত করে ধরলেন এবং মুখ দিয়ে দৃঢ় করে মায়ের স্তনকে চেপে ধরলেন। তিনি সকল ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করলেন এবং সঙ্কল্প নিলেন, 'মায়ের কোল আমি ছাড়ব না।'

কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান্ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর। কেশী, অঘ, বক, পূতনা, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংসাদি দৈত্যসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পরাস্ত করার অসীম শক্তি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও মায়ের কোল থেকে তাঁকে নীচে নামানোর জন্য মায়ের সম্মুখে কোন প্রতিরোধ তিনি খাড়া করতে পারলেন না। বিনা বাধায় মা তাঁকে পরাজিত করলেন।

'তুই এখানে বস'—মা তাঁকে বললেন এবং কৃষ্ণের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও যশোদা এক হাতেই কৃষ্ণকে কোল থেকে তুলে মাটিতে বসিয়ে দিলেন। যদি কারও মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি থাকে, তাহলে তাঁর নিকট তিনি শিশুবৎ হয়ে যান। তাঁর লীলাশক্তি যোগমায়াদেবীর ব্যবস্থাপনায় তাঁর অনন্তশক্তি তাঁকে ত্যাগ করে এবং তখন তিনি সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েন।

মা যদিও চেয়েছিলেন শিশুপুত্রকে দুধ পান করাবেন, তথাপিও কর্ত্তব্যের খাতিরে কৃষ্ণকে ছেড়ে চলে গেলেন। কৃষ্ণ তখন জোরে জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধও হলেন। মা আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি করলেন না, পরন্তু দুধ রক্ষার জন্য আমাকে ফেলে চলে গেলেন।

সেবকের সেবক—ভৃত্যের ভৃত্য

এই লীলা থেকে এটাই পরিষ্কার যে, যাঁরা কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁরা কৃষ্ণসেবায় ব্যবহৃত দ্রব্যগুলিকে রক্ষা করেন—থালা, বাসন, বস্ত্র, বংশী, ময়ূর-পাখা, খোল-করতাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ। যশোদা কৃষ্ণের চেয়ে এই সমস্ত উপকরণের উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু কেন? ইহাই ভক্তের স্বভাব। এটা সহজে বুঝা যায় না। আমাদের বুঝার জন্য নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।—

যশোদা মাঝে মাঝে কৃষ্ণকে বকুনি দিতেন যখন তিনি কাপড়ে ধূলাবালি

লাগাতেন, নোংরা করে ফেলতেন। মা বলতেন,—'ওঃ! তুই এত দুষ্টু, আমি এইমাত্র কাপড়টা ধুয়ে দিলাম, আর তুই এটাকে নোংরা করে ফেলেছিস্।'

এখানে যদিও কৃষ্ণ কাঁদছিলেন, তবুও যখন দুধ উথলে পড়ছিল, তখন মা শিশুপুত্রকে মাটিতে নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে চুল্লী থেকে দুধকে নামিয়ে রাখলেন। কেন? এই দুধের কি বিশেষতা আছে? দুধের ইচ্ছা ছিল—কৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা, কিন্তু যশোদার অগ্রাধিকার ছিল ঠিক তার বিপরীত। তিনি কৃষ্ণকে খুশি করার পূর্ব্বে দুধের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

কেন তিনি কৃষ্ণকে মাটিতে রেখে দুধ রক্ষা করতে গেলেন, এমনকি কৃষ্ণ ক্রন্দন করলেও তিনি এটা করলেন? ঠিক এই একই কারণে কাপড় নোংরা করায় যশোদা কৃষ্ণকে শাসন করতেন। দুধ যেমন ছিল কৃষ্ণসেবার জন্য, তদ্রূপ কাপড়গুলিও ছিল কৃষ্ণের জন্য।

ইহাই হচ্ছে শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য। যে-সকল ভক্ত সরাসরি তাঁর সেবা করেন, তাঁদের চেয়ে যাঁরা তাঁর ভক্তের সেবা করেন, তাঁদের প্রতি ভগবান্ অধিকতর স্নেহশীল হন। ভক্তের সেবকগণের প্রতি তিনি অধিক প্রসন্ন হন। এই ধারণা থেকে আমাদের অবশ্যই বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, ইহা অত্যন্ত অপরিহার্য্য।

উদাহরণস্বরূপ, শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত। কৃষ্ণ অধিক সন্তুষ্ট হন যাঁরা তাঁর (রাধারাণীর) সেবা করেন ; যাঁরা সরাসরি কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁদের উপর নন। কেউ যদি শ্রীমতী রাধারাণীর সেবক রূপমঞ্জরীর সেবা করেন, তাহলে কৃষ্ণ বলেন,—'ওঃ! তুমি রূপমঞ্জরীর সেবক! আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দিব, কি চাও তুমি?'—ইহাই হচ্ছে শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য।

প্রেমে বশীভূত

যশোদা গেলেন দুগ্ধভাণ্ড রক্ষা করতে—যা কৃষ্ণের সেবার জন্যই ছিল। স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় গাভীদুগ্ধও অত্যন্ত জরুরী ছিল। "আমার স্তন্যদুগ্ধ কৃষ্ণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়", তিনি ভাবলেন—"আমার স্তনদুধ থেকে সুমিষ্ট দই বানাতে পারব না, দই না হলে মাখন হবে না।" সেক্ষেত্রে পদ্মগন্ধা গাভীর দুধ রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। তাই তিনি ছুটে গেলেন, কিন্তু কৃষ্ণ কান্নাকাটি শুরু করলেন।

এখন কি বুঝা উচিত যদি কৃষ্ণ ক্রন্দন করেন? তিনি কি ক্রুদ্ধ, না ক্রুদ্ধ নন? বাহ্যিকরূপে দেখে মনে হয় তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু বাস্তবে অন্তরে তিনি খুবই সুপ্রসন্ন, অত্যন্ত খুশী, যদিও তিনি কান্না করছিলেন।

এখন কৃষ্ণ ভাবছেন, "আমার মা আমাকে পরিতৃপ্ত না করে ফেলে চলে গেলেন, সুতরাং আমি তাঁকে এক শিক্ষা দেব। আমি এখন অনিষ্ট করব।" তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নিকটে রাখা দধিভাণ্ডকে উল্টে ফেলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাকে নড়ানোর মত যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিল না। যদ্যপি পূতনাদি রাক্ষসগণকে তিনি বধ করেছিলেন, তথাপি যশোদার মাতৃস্নেহ তাঁকে এক ছোট শিশুতে পরিণত করেছে। তিনি এতই দুর্ব্বল ছিলেন যে, ওটাকে সরানো ত' দূরের কথা, নাড়াতে পর্য্যন্ত পারেন নি।

যেখানে স্নেহ-মমতার প্রাধান্য, সেখানে কৃষ্ণ তাঁর সমস্ত দৈবী ঐশ্বর্য্য ভুলে যান, এমনকি তাঁর ভগবৎসত্ত্বা পর্য্যন্ত। এই কারণেই দধি পাত্রটাকে উল্টাতে তাঁর শক্তি ছিল না, যেহেতু তিনি শিশু ও অত্যন্ত দুর্ব্বল।

দধিভাণ্ড ভঙ্গ

কৃষ্ণ চিন্তা করছেন, কি করা উচিত? আমি পাত্রটাকে উল্টাতে পারলাম না, এখন এটাকে ভেঙে দিব। পাত্রের উপরটা খুব মোটা, নীচের অংশটা পাতলা। যদি আমি নোড়া দিয়ে আঘাত করি, তাহলে এটা ভেঙে যাবে। যেমন ভাবনা, করলেনও তাই। একটী পাথর মেরে পাত্রের নীচটা ফুটো করে দিলেন। আর ঐ ছিদ্র দিয়ে সাদা দুধের সুন্দর ধারা নির্গত হয়ে সারা রান্নাঘরের মেঝেতে প্রবাহিত হতে লাগল।

দই সর্ব্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণের খুব আনন্দ হল। তিনি হাতে তালি দিলেন, হাসলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে চিন্তা করলেন,—'হায়! মা দেখলেই আমাকে শাস্তি দেবেন। তৎক্ষণাৎ ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন এবং চিন্তা করলেন—এই অপরাধস্থল পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে উত্তম হবে।'

এইরূপ চিন্তা করে কৃষ্ণ পাশের ঘরে চলে গেলেন। তিনি ভাবলেন,—'আমি লুকিয়ে থাকব, যাতে করে মা আমাকে দেখতে না পায়।' তখন তিনি তাঁর লীলাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে একজন সাধারণ বালকের মত অভিনয় করছেন। কিন্তু পরিণতিতে তিনি লক্ষ্য করেন নি যে, দইয়ের ধারার উপর খালি

পায়ে যখন তিনি হাঁটছিলেন, তখন ত্রিভুবন-বন্দনীয় দধিমাখা ছোট ছোট পদচিহ্ন পেছনে ফেলে আসছিলেন, যা ধরে তাঁর মা অনুসরণ করতে পারেন।

কৃষ্ণ তাঁর ভক্তগণকে পুরস্কৃত করেন

কৃষ্ণ পাশের ঘরে গিয়ে একটা উদূখল দেখতে পেলেন। তার উপর শিকা থেকে ঝুলে থাকা এক মাখনের হাঁড়ি লক্ষ্য করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিহ্বা থেকে জল পড়তে লাগল। তিনি উদূখলের উপর চড়ে বসে মাখন খেতে শুরু করলেন এবং বানর, কাককে খাওয়াতে লাগলেন। তথায় বানর ও কাক বহু সংখ্যায় জমায়েত হয়েছিল। কৃষ্ণ অত্যন্ত খুশীতে ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, "পূর্ব্বে আমার রামচন্দ্র-লীলায় যখন আমি বনবাসে ছিলাম, তখন এই বানরেরা এসে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। লঙ্কা যাওয়ার জন্য সেতু নির্ম্মাণে তারা দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করেছিল। ঐ সময় আমি তাদের না ঠিকমত খাইয়েছি, না তাদের পুরস্কৃত করেছি। তাই এখন আমি তাদের পেটভরে মাখন খাওয়াব। আর এই কাকেরা আমার বহুদিনের পুরানো প্রিয় ভক্ত ভুষণ্ডী কাকের বংশধর। সুতরাং এদেরও আমি খাওয়াব।"

ইতিমধ্যে কৃষ্ণ যখন আনন্দে কাক ও বানরদের খাওয়াচ্ছিলেন, তখন মা যশোদা ঘরের মধ্যে এলেন—যেখানে কৃষ্ণকে কোলে বসিয়ে স্তন্য পান করাচ্ছিলেন। কিন্তু দেখলেন মন্থনভাণ্ড ভাঙা, আর কৃষ্ণও সেখানে নাই। ঘরের মধ্যে মাখনচোরের চরণচিহ্ন লক্ষ্য করে পাশের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন যে, কৃষ্ণ কাক-বানরদের নিজের ঘরের মাখন খাওয়াচ্ছে।

এই ঘরের দুটো দরজা রয়েছে—একটা ভেতরের অন্দরমহল থেকে এই ঘরে প্রবেশ করার জন্য, দ্বিতীয়টা ঘরের বাহিরের আঙিনায় যাওয়ার জন্য। কৃষ্ণ অন্দরমহল হয়ে মাখন-ঘরে ঢুকেছিল। এখন তাঁর পৃষ্ঠদেশ ভেতরের দিকে আছে। মা যশোদা এই দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং চোরের মত নিঃশব্দে অগ্রসর হতে লাগলেন, ঠিক যেমন বিড়াল শুকনো ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যায়।

কৃষ্ণ বুঝতে পারেননি যে তাঁর মা নিকটে আসছেন। এদিকে বানরেরা ও কাকেরা মাকে দেখে দূরে সরে গেল ও বিভিন্নদিকে ভয়ে পালাল। কৃষ্ণ চিন্তা করলেন, এত আনন্দে যাদের খাওয়াচ্ছিলাম, তারা পালিয়ে গেল কেন? তখন

তিনি বুঝতে পারলেন নিশ্চয় ঘরের মধ্যে কেউ প্রবেশ করেছেন। যখনই মা যশোদা কৃষ্ণকে ধরতে উদ্যত হয়েছেন, তখনই তিনি কাঁধের উপর দিয়ে দেখতে পান আরে, 'মা আসছেন!' তখন দ্রুতগতিতে লাফিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

পরমতত্ত্বের তির্য্যক (আঁকাবাঁকা) গতি

কৃষ্ণ যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটতে লাগলেন এবং মা যশোদাও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়াতে শুরু করলেন। পেছন থেকে বললেন—'ও বানরের বন্ধু, এখানে আয়।' কৃষ্ণ দৌড়াচ্ছিলেন আঁকাবাঁকাভাবে এবং মাতা যশোদা সরু কোমর ও ভারী বক্ষস্থলের জন্য কৃষ্ণের ন্যায় দ্রুতগতিতে দৌড়াতে পারছিলেন না।

কৃষ্ণ এত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁর পেছনে দৌড়ে তাঁকে ধরা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তথাপি কৃষ্ণ দেখলেন যে, এই বুঝি মা আমাকে ধরে ফেললেন। তখন তাঁর মাথায় বুদ্ধি এল 'আমি আর ঘরের চতুর্দ্দিকে ঘুরব না, বাহিরে যাব।' বৈদিক সভ্যতায় মহিলারা একাকী উন্মুক্ত জায়গায় বেরোতেন না। কৃষ্ণ জানতেন যে, মায়ের পক্ষে রাস্তায় দৌড়ান অশোভনীয় হবে। তিনি ভাবলেন,—"আমি বাহিরে দৌড়াব যাতে তিনি আমার পেছনে আর দৌড়াতে না পারেন।"

প্রেমের গতি

মা যাতে ধরতে না পারে তজ্জন্য কৃষ্ণ বাহিরে বাহিরে দৌড়াচ্ছিল। মা যশোদা দরজার নিকট এসে ভাবতে লাগলেন,—'হায়! এখন আমি কি করি। তিনি চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, কেউ তাঁকে দেখছে কিনা। তারপর দুষ্ট ছেলেটাকে ধরার জন্য রাস্তার উপর দৌড়াতে লাগলেন। বহু প্রচেষ্টার পর তিনি নট্‌খট্ বালককে খপ করে ধরে ফেললেন। এক হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে অন্য হাতে লাঠি উঁচিয়ে শাসন করতে লাগলেন। লাঠি দেখে কৃষ্ণ এতই ভয় পেয়ে গেলেন যে, মায়ের চারপাশে এদিক্ ওদিক্ করে ঘুরতে লাগলেন।

এখানে এক সুন্দর শিক্ষা রয়েছে। আমরা আমাদের প্রেম দিয়ে কৃষ্ণকে বাঁধতে চাই। যখন কৃষ্ণ মায়ের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরার জন্য মাকে আরও অধিক গতিতে দৌড়াতে হয়েছিল। ভক্তদের এমনভাবে কৃষ্ণানুশীলন

করতে হবে যে, তাদের প্রেম ও ক্ষমতা যেন কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করে যায়।

ভক্তদের প্রতি যেমন কৃষ্ণের স্নেহ রয়েছে, তেমনই প্রিয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তদের ভক্তিও রয়েছে। যদি প্রেম সমতাসম্পন্ন অর্থাৎ কৃষ্ণ যত পরিমাণ ভক্তকে ভালবাসেন এবং ভক্তও যদি ঠিক সমপরিমাণে কৃষ্ণকে ভালবাসেন, তাহলে কৃষ্ণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কৃষ্ণের চেয়ে যদি তাঁর ভক্তের ভক্তি ও মমতা অধিক হয়, তাহলে তখন ভক্ত ভগবানকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। কৃষ্ণ তাঁর মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত ছিলেন এবং মাতাও শিশু কৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহশীল ছিলেন। সেই কারণে মা তাঁর প্রেমের শক্তিতে তাঁকে ধরে ফেললেন। এটাই এই লীলার গোপন রহস্য।

প্রেম-কলহ

মা যশোদা কৃষ্ণকে ধরে বকুনি দিতে শুরু করলেন,—'এমন মার মারব' বলে ভয় দেখালেন। আমি জানি, তুই মাখন চুরি করার জন্য লোকের ঘরে ঘরে যা, তুই চোর।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা, তুমি বলছ যে আমি চোর। কিন্তু আমার রাজ্যে, আমার পিতা নন্দবাবার বংশে কোন চোর নেই। সম্ভবতঃ তোমার বংশে এক মহাচোর আছে।

কৃষ্ণ অত্যন্ত ধূর্ত্ত ছিলেন। একদা তিনি মাতা যশোদা ও পিতা নন্দবাবার মধ্যে কথোপকথনের সময় বলতে শুনেছিলেন যে, মা যশোদার পূর্ব্বপুরুষেরা চোর ঘোষ পরিবারের। 'Cora' শব্দের অর্থ 'চোর' (Thief)। কৃষ্ণের এখন মনে হল যে, মায়ের পরিবারে চোর নামে কোন এক ব্যক্তি রয়েছে। এই কারণে কৃষ্ণ বললেন,—'আমার পরিবারে কেউ চোর নেই, কিন্তু তোমার বংশে নিশ্চয়ই এক 'চোর' আছে।'

'কেন তুমি আমাকে শাস্তি দিচ্ছ?' কৃষ্ণ সরল অন্তঃকরণে প্রতিবাদ করলেন, 'আমি কি করেছি?'

ক্রুদ্ধ হয়ে মা উত্তর দিলেন,—'দধিভাণ্ড কেন ভেঙেছিস্?'

কৃষ্ণ বললেন,—'সেটা ভগবান্ কর্ত্তৃক শাস্তি ছিল।'

মা বললেন,—'বানরদের কে মাখন খাওয়াচ্ছিল?'

কৃষ্ণ বললেন,—'যিনি বানরদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই খাওয়াচ্ছিলেন।'

মা একটুও না রেগে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এখন সত্য করে বলতো দধিভাণ্ডটা কে ভেঙেছে?'

কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করলেন,—'হে মাতঃ! যে দুধটা উথলে পড়ে যাচ্ছিল, তাকে প্রশমিত করার জন্য তুমি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লাফ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছিলে। তখন তোমার ভারী নুপূর দধিভাণ্ডকে আঘাত করতেই ভেঙে গেল। আমি কিছুই করিনি।'

'ইহা কি সত্য? তাহলে তোমার সারা মুখে মাখন লাগল কি করে?'

কৃষ্ণ বললেন,—'হে মাতঃ! প্রতিদিন এক বানর আসে এবং মাখন খাওয়ার জন্য হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকায়। আজ আমি তাকে ধরে ফেলেছিলাম। সে পাত্রের ভেতর থেকে হাত টেনে দৌড়ে পালাতে লাগল। কিন্তু যাওয়ার সময় তার হাতের সমস্ত মাখন আমার সারা মুখে মাখিয়ে দিল। আচ্ছা বলো ত' মা, এর জন্য কি আমি দায়ী? তথাপি তুমি আমাকে চোর বলছ ও মারতে উদ্যত হয়েছ!

'ওরে, তুই এক বড় মিথ্যাবাদী,' মা প্রত্যুত্তরে বললেন।

প্রেম ও ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের বন্ধন

যশোদা মা মনে মনে চিন্তা করলেন,—'এখন আমি কি করি! আমার ছেলেটা অত্যন্ত চতুর ও দুরন্ত। সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আর এই অভদ্র আচরণের জন্য যদি আমি শাস্তি না দেই, তাহলে ভবিষ্যতে ও বড় দস্যুতে পরিণত হবে।' কিছুক্ষণ যাবৎ মনে মনে চিন্তা-ভাবনা করে বললেন,— 'এই উদূখলটা তোকে মাখন চুরি করতে সাহায্য করেছে। সেজন্য আমি তোকে আর তোর দুষ্টু সঙ্গী উদূখলটাকে একসঙ্গে বেঁধে শাস্তি দিব।'

মা যশোদা রেশমের একটা ফিতে নিলেন—যেটা দিয়ে তিনি মাথার চুল বাঁধতেন। তা দিয়ে তিনি কৃষ্ণকে উদূখলের সঙ্গে বাঁধার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা দু'আঙ্গুল কম ছিল। তাঁর দাসীরা আরও দড়ি আনল। সেগুলো জুড়ে তা

দিয়ে যখন বাঁধতে গেলেন, তখনও দু'আঙ্গুল ছোট হয়ে গেল। দাসীরা পুনরায় ঘর থেকে আরও দড়ি আনতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যতই দড়ি এনে একসঙ্গে যুক্ত করা হল, প্রতিবারেই দু'আঙ্গুল করে কম পড়তে লাগল।

গোপীরা সব হাসতে লাগল, হাততালি দিতে লাগল। তারা মা যশোদাকে বলল,—'হে প্রিয় যশোদে! আমরা তোমাকে পূর্ব্বে বলেছি যে, তোমার এই বালকের কোনও এক অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি আছে। ও বড় বড় চোরদের চেয়েও বেশী চতুর।' মা চিন্তা করলেন,—'সে আমার ছেলে, আমার গর্ভজাত। যদি আমি তাঁকে বাঁধতে না পারি, তাহলে ত' অত্যন্ত লজ্জার বিষয়!'

সেই সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত মা বার বার চেষ্টা করলেন কৃষ্ণকে বাঁধার জন্য। তিনি ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গিয়েছিল। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিলেন। শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছিল। তাঁর বেণী থেকে পুষ্পসমূহ খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল। কৃষ্ণ যতক্ষণ বাঁধা পড়তে অস্বীকার করছিলেন, মায়ের ক্রমাগত প্রচেষ্টাসমূহও ব্যর্থ হচ্ছিল।

অবশেষে মায়ের ক্লান্তিকর অবস্থা দেখে কৃষ্ণের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল। সন্তানের কল্যাণের জন্য মায়ের প্রচেষ্টা, গভীর প্রেম ও ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল কৃষ্ণকে বন্ধন করার উদগ্র বাসনা। অবশেষে প্রেমরজ্জুতে বাঁধা পড়তে বাধ্য হলেন কৃষ্ণ।

তাঁর লীলাশক্তি যোগমায়া তৎক্ষণাৎ বিস্তার করলেন তাঁর প্রভাব। মা যশোদা তখন ঐ একই ফিতা—যেটা তিনি প্রথমে মাথা থেকে খুলে নিয়ে এতক্ষণ কৃষ্ণকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারেন নি, সেই ফিতে দিয়ে এখন অনায়াসে কৃষ্ণকে বেঁধে ফেললেন।

রজ্জুর (দড়ি) বার বার দু' আঙ্গুল কম হওয়ার তাৎপর্য্য কি? এক অঙ্গুলি ভক্তির কারণে আমাদের (সাধকের) নিজেদের কঠোর প্রচেষ্টাকে ইঙ্গিত করেছে। দ্বিতীয় অঙ্গুলি কৃষ্ণের কৃপাকে নির্দ্দেশ করছে। যখন কৃষ্ণ তাঁর সেবার জন্য সেবকের (আমাদের) পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা দেখেন, তখন তাঁর হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হয়ে যায়। তখন তাঁর অহৈতুকী কৃপায় তিনি ভক্তের প্রেমের নিকট বাঁধা পড়েন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমের বন্যা

যশোদার সন্দিগ্ধতা

সফলতাপূর্ব্বক কৃষ্ণকে বন্ধন করে মাতা যশোদা গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকে পুনরায় মন্থনকার্য্য শুরু করলেন। কিন্তু পুত্রের কথা চিন্তা করে তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত ছিল, মন ছিল বিচলিত—'কেন আমি তাঁকে বাঁধলাম?' তিনি চিন্তা করছেন,—'আমার বোধ হয় এটা করা ঠিক হয় নি। কিন্তু না, তাঁকে বেঁধে আমি ঠিকই করেছি। যদি না করতাম, তাহলে সে অন্য কোন দুষ্টামি করত।' আবার কিছুক্ষণ পরে ভাবছেন,—'না, আমি মনে হয় কাজটা ঠিক করিনি।' কৃষ্ণের শরীর অত্যন্ত কোমল ও সুন্দর, আমি তাকে অত্যধিক যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছি। না, না, কেবল তা নয়, আমি নিজেকেও অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমার নিজের চিত্তকে অনেক দুশ্চিন্তায় ফেলেছি।'

এখন আমি কি করি? কৃষ্ণ এখন খুব রেগে আছে। ভয় হয়, যদি এখন আমি তাকে খুলে দেই, তাহলে সারা ব্রজমণ্ডল ঘুরে বেড়াবে এবং তার গতিবিধি আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। যাই হোক, মায়ের মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হওয়ায় তিনি মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। ঘরের মধ্য থেকে তিনি লক্ষ্য করে দেখছিলেন, কৃষ্ণ কি করছে।

বিপক্ষ দল

ইতিমধ্যে কৃষ্ণের গোয়াল সখারা তাঁকে ঘিরে ধরে তাঁর সঙ্গে নানা মজা করতে শুরু করল। যেহেতু তারা কৌতুক করে হাসাহাসি করছিল এবং হাতে তালি দিচ্ছিল, তা দেখে কৃষ্ণও তাদের সঙ্গে হাসাহাসি করছিলেন। চোখের জল এবং কাজল মিশ্রিত হয়ে এক অপরূপ কালো ধারা তাঁর মুখমণ্ডল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁর শরীর ভয়ে শুষ্কপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণ আনন্দে মেতে ছিলেন এবং ভুলেই গিয়েছিলেন যে তাঁর মা কি করেছিলেন। গোপবালকেরা পরস্পর আলোচনা করতে লাগল,—'কেন আমরা দড়িটা খুলে ওকে মুক্ত করে দিচ্ছি না? কৃষ্ণ অত্যন্ত উৎসাহী হলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দড়ি খোলার জন্য উদূখল পর্য্যন্ত আমার হাত যাবে না, সুতরাং তোরা তাড়াতাড়ি করে খুলে দে।" তা শুনে বন্ধুরা একের পর এক সকলে এসে দড়ি খোলার

চেষ্টা করল ; কিন্তু দড়ির বন্ধন এত শক্ত ছিল যে, তা কেউ খুলতে পারল না। তথাপি তারা চেষ্টা করল। যখন একজন অকৃতকার্য্য হল, তখন অন্যান্যরা বলল,—'ওহে, তুই খুলতে পারলি না, দেখ, আমি কেমন পারি।' তখন সেও বাঁধন খোলার জন্য বহু চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

বহুবার চেষ্টা করেও সকলেই ব্যর্থ হল কিন্তু নাছোড়বান্দার মত অটল রইল। কৃষ্ণের সবচেয়ে মজাদার বন্ধু মধুমঙ্গল বিশেষ করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। 'ওঃ! তোরা সকলেই অকর্ম্মণ্য! তোদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। দেখ, আমি কেমন খুলে দিচ্ছি।' মধুমঙ্গল সকলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজে সামনে এগিয়ে এল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন সকলেই তাকে উপহাস করতে লাগল।

চিৎকার, চেঁচামেচি ও হৈ-হুল্লোড় করতে করতে বালকেরা ভাবল, যদি বলদেব ভাই থাকতেন, তাহলে মুহূর্ত্তের মধ্যে কৃষ্ণকে খুলে দিতে পারতেন এবং সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমরা তখন অন্য কিছু খেলা খেলতে পারতাম।

এমন সময়ে বলদেব প্রভুকে নিয়ে রোহিণীমাতা আসছিলেন। বলদেব প্রভু দেখলেন আঙিনায় কৃষ্ণের সঙ্গে সকল রাখাল বালকেরা কি যেন করছে। নিকটে গিয়ে দেখলেন যে, কৃষ্ণ উদূখলের সঙ্গে বাঁধা আছে। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এটা কে করেছে? আমি নিশ্চিতরূপে তাকে কঠোর শাস্তি দেব।' তিনি এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, তাঁর চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল এবং ক্রোধে হাতদুটি কাঁপছিল। তখন সুবলসখা তাঁর কানের কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল,—'হে ভ্রাতঃ! এত বিচলিত হয়ো না, মা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করে রেখেছে।'

'মা করেছে! যদি মা করে থাকে, তাহলে ত' আমি কিছুই করতে পারব না।'

বলদেব প্রভু চিন্তা করতে করতে ফিরে গেলেন, নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন গোপন রহস্য আছে।

মুক্তির পরিকল্পনা

যখন এইরূপ চলছিল, তখন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক লীলা স্মরণ করছিলেন—যা তাঁর পূর্ব্বলীলায় ঘটেছিল। এখন আমার স্মরণ হচ্ছে যে, আমার প্রিয় ভক্ত দেবর্ষি নারদ নলকুবর ও মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

এরা দুজন শিবভক্ত ধনপতি কুবেরের পুত্র ছিল। শিব কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং নিজজন। তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে এক সম্বন্ধও ছিল। সর্ব্বজনবিদিত দেবর্ষি নারদ কুবেরের মিত্র ছিলেন।

একদা নারদ দেখলেন যে, কুবেরের দুই পুত্র এক হ্রদে কতকগুলি স্বর্গের সুন্দরী অপ্সরাদের সঙ্গে জলকেলি করছে। তারা সকলে উলঙ্গ ছিল। তারা জলের মধ্যে লুকোচুরি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের খেলা খেলছিল। যখন নারদমুনি তাদের নিকটবর্ত্তী হলেন, তখন লজ্জায় যুবতীরা দ্রুত জলের উপরে এসে তাদের বস্ত্রাদি পরিধান করে নিল এবং অনুতপ্ত হয়ে মুনিবরকে প্রণাম নিবেদন করল। কিন্তু কুবেরের এই পুত্রদ্বয় এতই ঔদ্ধত্য ও লজ্জাহীন ছিল যে, তারা তাদের আচরণের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাল না। তারা মদ্য পান করে কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতাল হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত নির্লজ্জ হয়ে নারদঋষিকে ও কুমারীগণকে কর্কশ ভাষায় বলতে লাগল,—"এই পাগলটা কেন এখানে এসেছে? সে একদম অবোধ ও অনভিজ্ঞ এবং তোমরাও অবিশ্বাসী হয়ে তাকে দেখামাত্র হ্রদ ছেড়ে উঠে পড়লে! এখন আমাদের মেজাজটা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিলে।"

তারা দুজন কাপড় না পরে নগ্ন অবস্থায় মুনিবরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের লজ্জা ও সাধারণ জ্ঞান পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। কিভাবে শ্রেষ্ঠ ও সাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, তা তারা জানত না। নারদমুনি দেখলেন যে, তারা শুষ্ক (চেতনতাহীন) বৃক্ষের ন্যায়। তিনি চিন্তা করলেন, এরা প্রভু শিবের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত, তজ্জন্য আমি এদের একটু উচিত শিক্ষা দিতে চাই।

এক কঠোর শিক্ষা

যে ব্যক্তির পায়ে কাঁটা ফুটেছে, সে জানে কাঁটার কি যন্ত্রণা। কিন্তু যার কোন অভিজ্ঞতা নেই, সে অপরকে অতি সহজেই কষ্ট দিতে পারে, তার কোন অনুশোচনা হয় না। আমরা দেখতে পাই, কেবল মাংসের লোভে মানুষ কিভাবে মাছের মুণ্ড কাটে, ছাগল, গরু, মহিষাদির গলা কাটে। এইসকল কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের শরীরে যদি সচেতনতার সূঁচ (Injection) প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তারা তাদের হৃতচেতনা ফিরে পাবে এবং বুঝতে পারবে, আমাদের এটা করা উচিত হয়নি। যদি কোন একজন প্রকৃতির আইন (Law of nature) বুঝতে পারেন, তাহলে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আমি অপরের আঙ্গুল কেটে যে যন্ত্রণা তাকে দিয়েছি, নিশ্চয়ই আমার কাছে তা যন্ত্রণারূপে

ফিরে আসবে। 'Meat'-শব্দের অর্থ আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। Meat=Me eat অর্থাৎ "যাদের মাংস আমি ভক্ষণ করছি, পরবর্ত্তিকালে তারাই আমাকে ভক্ষণ করবে।" প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। যদি তুমি কারোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার কর, তাহলে বিনিময়ে তুমিও একই দুর্ব্যবহার পাবে। কাকেও যদি তুমি থাপ্পড় মার, তাহলে তোমাকেও কেউ না কেউ থাপ্পড় মারবে। যে-সব জন্তুদের গলা কাটা হচ্ছে, তারা পরবর্ত্তিকালে মনুষ্যশরীর লাভ করবে এবং তাদেরকেই খাবে—যারা পূর্ব্বজীবনে তাদেরকে খেয়েছিল। সে-কারণে আমাদের মাছ-মাংস খাওয়া উচিত নয়।

নলকুবর ও মণিগ্রীব সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং দেখতেও সুন্দর ও সম্পদ্‌শালী ছিল। তারা অত্যন্ত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যধিক বৈভবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভগবানকে আদৌ বিশ্বাস করে না, নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণভজন করে না এবং ভগবানের শ্রীচরণে তাদের চিত্তবৃত্তিকেও নিবেদন করে না। তারা নিজেকে অত্যন্ত শিক্ষিত ও সুন্দর মনে করে মিথ্যা অহঙ্কারে অভিমানী হয়। 'আমি এক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছি, আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রচুর বৈভব আছে'—যারা এইরকম চিন্তা করে, তারা কখনও কৃষ্ণের ভজন করতে পারে না।

দেবর্ষি নারদ বুঝতে পারলেন যে, এরা দুজনে অধঃপতিত হয়েছে। তিনি স্থির করলেন, এদের একটু ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। "তোমরা অচেতন বৃক্ষের ন্যায় ব্যবহার করছ, উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ এবং গুরুবর্গকে অগ্রাহ্য করছ। তোমরা নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করছ। অতএব তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও।"

তাঁর অভিসম্পাৎ অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। মণিগ্রীব ও নলকুবর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে, তারা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে—বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তারা শীঘ্রই নারদমুনির চরণে পতিত হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করল—"হে মুনিবর! আপনি যে এত প্রভাবসম্পন্ন, তা আমরা কখনও বুঝতে পারিনি। আমরা মিথ্যা আত্মাভিমানে নিমজ্জিত ছিলাম। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, কৃষ্ণভজন করার জন্য ভগবান্ এই মানবশরীর প্রদান করেছেন। ভগবান্ কে—তা আমরা এখন উপলব্ধি করছি। আমরা আমাদের বহু মূল্যবান্ সময় মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদে অপচয় করেছি। আপনি আমাদের প্রতি করুণাশীল হোন—সত্যি সত্যি যেন আমাদের বৃক্ষযোনি লাভ না হয়।"

দেবর্ষি নারদ বললেন,—"আমি যে অভিসম্পাৎ দিয়েছি, তা অবশ্যই ফলবে। একবার বাক্য নির্গত হলে, তা আর নিবৃত্ত করা যায় না। বড়জোর আমি শাস্তি কিছুটা লাঘব করে দিতে পারি, যেহেতু তোমরা এখন তোমাদের ভুল বুঝতে পেরেছ, এবং সর্ব্বোপরি, তোমরা আমার বন্ধুর পুত্র। তোমরা দুটি বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, কিন্তু তোমাদের জন্ম হবে বৃন্দাবনে। কিছুদিন পরে, তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, তার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় কৃষ্ণ আবির্ভূত হবেন। যখন তিনি বাল্যকালে শিশুরূপে খেলাধূলা করবেন, তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ প্রদান করে তোমাদিগকে শাপমুক্তি করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও প্রদান করবেন। এই সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণ করে যুবকদ্বয় শান্ত হল।

নলকুবর ও মণিগ্রীবের মুক্তি

নারদমুনির ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে কৃষ্ণ চিন্তা করলেন,—"আমি আমার ভক্তের মনোবাসনা অবশ্যই পূরণ করব। কৃষ্ণ এতই দক্ষ ছিলেন যে, এক কার্য্যের মধ্য দিয়ে তিনি বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁর সখাদের উদূখলটাকে নন্দবাবার ঘরের চত্বর থেকে বাইরে ঠেলতে বললেন এবং সখারা উদূখলটা বহির্দ্বারের দিকে ঠেলতে ও টানতে শুরু করল। প্রধান ফটকের বাইরে দুটি লম্বা অর্জ্জুন বৃক্ষ দাঁড়িয়েছিল। বৃক্ষদুটি বিশাল জায়গা জুড়ে সুশীতল ছায়া বিস্তার করেছিল এবং তাদের প্রশস্ত শাখা-প্রশাখায় হাজার হাজার পাখি আশ্রয় নিয়েছিল।

বৃক্ষদুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। উভয়ের মধ্যে একটু সঙ্কীর্ণ রাস্তা ছিল। কৃষ্ণ দুটো বৃক্ষের মধ্যকার সরু রাস্তা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চললেন। কিন্তু উদূখলটি রাস্তার থেকে অধিকতর চওড়া ছিল। যখন রাখাল বালকেরা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল তখন দুটি গাছের মাঝখানে উদূখলটা আটকে গেল অর্থাৎ তারা প্রকারান্তরে কৃষ্ণের সঙ্গে সংস্পর্শযুক্ত হল। তখন ঠিক যেন এক তড়িৎপ্রবাহ কৃষ্ণের শরীর থেকে নির্গত হয়ে রজ্জুর মধ্য দিয়ে উদূখল হয়ে অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করল। কেহ যদি উদূখলকে স্পর্শ করে, তাহলে সে অবশ্যই অপ্রাকৃত তড়িৎপ্রবাহের সংস্পর্শ লাভ করবে।

যখন কৃষ্ণ বার বার উদূখলকে টানতে লাগলেন, তখন নারদমুনির কৃপায় বৃক্ষ দুটি কৃষ্ণের স্পর্শের নিকট আত্মসমর্পণ করল এবং প্রচণ্ড শব্দে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। কৃষ্ণের সখারা তাঁর সঙ্গে আনন্দে খেলা করছিল, টানাটানি

করছিল, চিৎকার ও মজা করছিল। কিন্তু যখন অপ্রত্যাশিতভাবে অর্জ্জুন বৃক্ষদুটির পতন হল, তখন বালকেরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। কি করে ইহা ঘটল! বৃক্ষদুটি নড়বড় করতে করতে পড়ে গেল, আর সুন্দর দুই অধিদেবতা কৃষ্ণের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন! তাঁরা কৃষ্ণের স্তব-স্তুতি, প্রার্থনা ও প্রণাম নিবেদন করলেন এবং কৃষ্ণ তাঁদের স্বীয় অপ্রাকৃত ধামে ফিরে গিয়ে তাঁর আশ্চর্য্যজনক লীলাসমূহ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করার জন্য আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁরা হাতজোড় করে কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মহিমান্বিত গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন।

যশোদার ভয় ও আঘাত

অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের পতনের শব্দে সমগ্র ব্রজভূমি কেঁপে উঠেছিল এবং সমস্ত ব্রজবাসিগণ এই ভয়ঙ্কর শব্দের উৎসস্থলের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে মাতা যশোদাও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। যখন এই ভয়ঙ্কর শব্দ তাঁর কর্ণগোচর হল, তখন তিনি ভয়ভীত হলেন। 'কোথা থেকে এই শব্দ আসছে?' আহা, যেখানে কৃষ্ণ আছে তার খুব নিকটবর্ত্তী, খুব কাছে। ভয়ে তাঁর হৃদয় দুরু দুরু করতে লাগল। তিনি তৎক্ষণাৎ শব্দের উৎসের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। অন্যান্য সকল ব্রজবাসীরাও শীঘ্র ছুটে এল। অকুস্থলে পৌঁছে তাঁরা সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন এবং তাঁদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালেন।

বৃক্ষদুটি কৃষ্ণের বাঁদিকে ও ডানদিকে পড়েছিল, তাঁর উপরে নয়, ফলে তাঁর কোন আঘাত লাগেনি। তথাপি তাঁরা সকলেই ভীত। যশোদা দূর থেকে এগুলো দেখছিলেন। হায়! বৃক্ষদুটি উপড়ে পড়ে গেছে, আর কৃষ্ণ বৃক্ষদুটির মাঝখানে! যদি বৃক্ষদুটি কৃষ্ণের উপরে পড়ত, তাহলে কি যে ঘটত! অতঃপর তিনি আর কোন কিছুই চিন্তা করতে না পেরে শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় অচৈতন্য হয়ে গেলেন। তাঁর কোনরূপ চেতনতা ছিল না তৎকালে, চোখে কোনরূপ অশ্রুধারাও ছিল না, তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসও নিচ্ছিলেন না। কেবল থামের ন্যায় জড়ীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

নন্দবাবা পরম পুরুষোত্তমকে মুক্ত করলেন

নন্দবাবা তখন ব্রহ্মাণ্ডঘাটে স্নান করছিলেন, তিনিও ছুটে দেখতে এলেন এই মহাভয়ঙ্কর শব্দের কারণ কি? যখন তিনি কৃষ্ণকে উদূখলের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় দেখলেন, তখন তিনি হতচকিত ও বোবা হয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত

ক্রুদ্ধও হলেন। তিনি কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,—'এটা কে করল?'

ইতিমধ্যে ছোট ছোট বালকেরা চারপাশে জড়ো হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল,—"বাবা, বাবা, কৃষ্ণ এই বৃক্ষদুটিকে স্পর্শ করতেই তারা উপড়ে পড়ে গেল। বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য হতে দুইটী অপরূপ সুন্দর ব্যক্তি দেবতার মত অথবা সূর্য্যরশ্মির মত বেরিয়ে এল। তারা কৃষ্ণকে বন্দনা করল এবং কৃষ্ণ তাদেরকে কিছু বলল। তারা কয়েকবার কৃষ্ণের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে তাঁর সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল এবং তারপর উত্তরদিকে চলে গেল।"

নন্দবাবা তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি ভাবলেন,—'এই বালকেরা এতই সরল।' কৃষ্ণ কি করে এত বড় বৃক্ষের মূলোৎপাটন করতে পারে! হতে পরে কংস এই দুই দৈত্যকে পাঠিয়েছিল কৃষ্ণকে মারার জন্য। হঠাৎ করে তিনি অচিন্ত্যনীয় চিন্তা করে বসলেন,—"যদি কৃষ্ণ মারা যেত, তাহলে কি হত?" অতঃপর তিনি আর কিছু চিন্তা করতে পারলেন না।

বৃক্ষদুটির পতনের পর কৃষ্ণ মনের সুখে হাসতে লাগলেন। যাই হোক, যখন তিনি দেখলেন যে, দূরে নন্দবাবা আসছেন, তখন তিনি জোরে জোরে কান্না শুরু করলেন। নিকটে পৌঁছালে নন্দবাবাকে করুণসুরে বললেন,—"মা আমাকে মারবেন বলেছেন!" তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর কথা ও কান্নার মধ্যে লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস নিতে লাগলেন। নন্দবাবা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ আরও জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। নন্দবাবা তাঁর গায়ের শাল দিয়ে কৃষ্ণের চোখের জল মুছিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—'হে পুত্র, কে তোমাকে এইভাবে বেঁধেছে?' কিন্তু কৃষ্ণ কোন উত্তর দিলেন না।

নন্দবাবা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"কে তোকে বেঁধেছে? আমাকে বল। সে যেই হোক আমি তাকে শাস্তি দেব।" তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং স্বয়ং উদূখলের সঙ্গে বাঁধা কৃষ্ণের দড়ির বাঁধন খুলে দিলেন। অবশেষে বাবার কানের নিকট মুখটা নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন,—"মা আমাকে বেঁধেছে।"

কৃষ্ণের দ্বারা গোপন রহস্য প্রকাশ হতেই নন্দবাবা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। "এমন করে তোর মা তোকে বেঁধেছে! আহা! আমি জানতাম না যে তিনি এত নিষ্ঠুর প্রকৃতির!"

তিনি কৃষ্ণকে একটা লাড্ডু দিলেন। কৃষ্ণ হাতে নিলেন, কিন্তু খেলেন না। তিনি কোনক্রমে শান্ত হচ্ছিলেন না—চোখের জলও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়নি। নন্দবাবা তাঁর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ ভয়ভীত মায়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মা যশোদার কিন্তু কোন বাহ্যিক চেতনা ছিল না, তিনি নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন। তাঁর সখীরা তাঁকে ঘিরে ধরে অপেক্ষা করছিল। তারা যশোদার চিত্তকে বুঝতে পেরেছিল এবং অন্তরে অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিল। তারা মনে মনে চিন্তা করছিল কখন কৃষ্ণ ছুটে এসে আগের মত মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নন্দবাবা কিন্তু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণ-বলরামকে যথাক্রমে বাম ও ডান কাঁধে নিয়ে স্নানের জন্য যমুনার তীরে ব্রহ্মাণ্ডঘাটে গেলেন। তিনি তাঁদের যমুনার জলে স্নান করালেন—যাতে তাঁরা এই অশুভ ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হতে পারেন।

স্নানান্তে পুনরায় কৃষ্ণ-বলরামকে কাঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। সময়টা ছিল অপরাহ্ণ। ঐ দিন যশোদার বাড়ীতে কেউ আর রান্না পর্য্যন্ত করেনি। কে রান্না করবে? মা যশোদা এবং তাঁর সখীরা মানসিকভাবে এতই বিপর্য্যস্ত ছিলেন যে, তাঁরা মহাশূন্যের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেহই রান্নার কথা চিন্তাই করেনি, খাওয়া ত' দূরের কথা।

গোশালায় ভোজন

রোহিণীমাতা যখন দেখলেন যে, নন্দবাবা দুই বালককে নিয়ে আসছেন, তখন তিনি তড়িঘড়ি করে রান্নাঘরে ঢুকে অল্প করে সুমিষ্ট পরিজ (জল বা দুধে যবাদি সিদ্ধ করে প্রস্তুত নরম খাদ্য) তৈরী করে নন্দবাবার হাতে দিলেন। তিনি তা বালকদ্বয়কে খাওয়ালেন—প্রথমে বলদেবকে, পরে কৃষ্ণকে। যখন তাঁরা তৃপ্ত হলেন, তখন স্বয়ং অল্প একটু খেয়ে ঘরের বাহিরে বেরিয়ে এলেন।

ভারতের ঘরগুলো—বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত পরিবারে—দুভাগে বিভক্ত। সাধারণতঃ অন্দরমহলের ঘরগুলো মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। রান্নাঘর, শয়নকক্ষ, খাবার ঘর ও অন্যান্য ঘর—যেখানে তারা গৃহের কাজকর্ম্ম করতে পারে। আর বহির্মহল পুরুষদের জন্য—যেখানে আছে উঠান, সভাগৃহ, বস্ত্রাদি শুকানোর ঘর (বানরেরা যাতে না নিয়ে পালায়)। এখন নন্দবাবা কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে বহির্মহলে গেলেন।

অপরাহ্ন পেরিয়ে গেছে, এখন সান্ধ্য ভোজনের সময়। তথাপি কেহই রান্না করেনি। সুতরাং নন্দবাবা বালকদের নিয়ে গোশালায় গেলেন। সেখানে গরুর দুধ সরাসরিভাবে কৃষ্ণ-বলরামের মুখে দোহন করে দিলেন এবং কিছু মিছরিও খাওয়ালেন। যতক্ষণ না তাঁদের পেট ভরছে, ততক্ষণ তাঁরা খেলেন, দুধ পান করলেন এবং অবশেষে তাঁদেরকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তখন রাত্রি হয়ে গিয়েছিল।

মা যশোদার নিকট কৃষ্ণকে আনয়ন

এখন যশোদার সমস্ত সখীরা, বিশেষ করে রোহিণী ও উপানন্দের পত্নী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সমস্ত বয়স্কা গোপীগণ রোহিণী মাতার সহিত যেখানে নন্দবাবা কৃষ্ণ-বলরামকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন, সেখানে আসলেন।

বয়স্কা গোপীগণ বলদেবকে বললেন,—'তুমি কৃষ্ণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তুমি বড় ভাই, সুতরাং কৃষ্ণ তোমার কথা অবশ্যই শুনবে। শীঘ্রই তুমি কৃষ্ণকে মা যশোদার কোলে নিয়ে যাও।' বলরাম কৃষ্ণকে টানতে গেলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে এমন এক জোরে ধাক্কা দিলেন যে, বলরাম মাটিতে পড়ে গেলেন। কৃষ্ণ দুহাতে নন্দবাবার গলা জড়িয়ে ধরলেন। রোহিণীদেবী বললেন,—"হে নন্দরাজ, কৃষ্ণের মা যশোদা সারাদিন কিছু খায়নি। তিনি নিশ্চল হয়ে পাথরের ন্যায় ঘরের এক কোণে বসে আছেন। বাড়ীর সমস্ত গোপীরা দুঃখিত, তারাও চুপচাপ হয়ে গেছে, কিছুই খাওয়াদাওয়া করেনি।"

নন্দরাজ বললেন,—'আমি কি করতে পারি? তাঁর বুঝা উচিত যে এটা তাঁর ক্রোধের ফল। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন।' বয়স্কা গোপীদের চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে অশ্রুধারা পড়তে লাগল। "হায়! হায়! আপনার তাঁকে নিষ্ঠুর বলা উচিত নয়। এইরূপ ভাষা তাঁর পক্ষে অনুপযুক্ত। বাস্তবিক অন্তরে-বাহিরে তিনি অত্যন্ত কোমল।"

এইকথা শুনে নন্দবাবাও আবেগপূর্ণ হয়ে গেলেন। 'কানাই, তুমি কি তোমার মায়ের কাছে যাবে?'

'না, না, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।' কৃষ্ণ জোর দিয়ে উত্তর দিল—'আমি আমার বাবার সঙ্গে থাকব।'

তখন রোহিণী মাতা কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন,—'কৃষ্ণ, রাত্রে তুমি কোথায় থাকবে? কোথায় তুমি ঘুমাবে?'

'আমি বাবার সঙ্গে থাকব। তাঁর নিকটে ঘুমাব।'

'তোমার মার সঙ্গে নয়?'

'না।'

উপানন্দের পত্নী বললেন,—'তুমি বাবার সঙ্গে থাকতে পার, কিন্তু খাবে কি? কে তোমাকে স্তনদুগ্ধ পান করাবে?'

'আমি সরাসরি গাভীর স্তন থেকে দুধ পান করব। বাবা আমাকে তা দেবেন এবং তিনি মিছরিও দেবেন।'

'কে তোমার সঙ্গে খেলবে?'

'বলরাম ভাই ও বাবার সঙ্গে খেলব।'

'তবু তুমি মায়ের কাছে যাবে না।'

'না, আমি কখনই তাঁর কাছে যাব না।'

নন্দবাবা বললেন,—'তুমি রোহিণী মায়ের কাছে কেন যাচ্ছ না?'

কৃষ্ণ ফোঁপাতে ফোঁপাতে একটু ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন,—'আমি যখন চিৎকার করে মাকে ডাকছিলাম এবং আমাকে খুলে দিতে বলেছিলাম, তখন মা আসেননি, রোহিণী মাতাও না।'

একথা শুনতেই রোহিণী মাতার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি কোমলস্বরে বললেন,—'বাবা, এত নিষ্ঠুর হয়ো না, তোমার মা তোমার জন্য কাঁদছেন।'

যখন একথা শুনলেন, তখন কৃষ্ণের চোখও জলে ভরে গেল। তিনি মুখ ঘুরিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালেন। বাবার চোখ দিয়েও জল পড়তে লাগল। 'পুত্র! তোমার মাকে আমি থাপ্পড় মারব?'—নন্দবাবা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হাত তুলে এমন এক ভঙ্গী করলেন যেন কাউকে মারছেন। কৃষ্ণ তা সহ্য করতে পারলেন না, তিনি খপ্ করে বাবার হাত ধরে ফেললেন। ঐ মুহূর্তে নন্দবাবা যশোদার হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন।

অতঃপর রোহিণী মাতা কৃষ্ণকে বললেন,—'কি করবে যদি তোমার মা..........।' তিনি থামলেন এবং স্বীয় মস্তকের উপর হাত রেখে যেন বলতে চাইলেন, 'যদি তোমার মা মারা যান!'

এই মন্তব্য শুনে কৃষ্ণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং জোর করে চিৎকার করতে লাগলেন—'মা, মা' বলে। তিনি পিতার কোল থেকে লাফ দিলেন এবং

দুবাহু প্রসারিত করে মায়ের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। রোহিণী মাও কাঁদছিলেন। তিনি ক্রন্দনরত কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন এবং তাড়াতাড়ি অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে মা যশোদার কোলে সঁপে দিলেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত মা যশোদা শোকে পাথরের মূর্ত্তির মত অচেতন অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু যখন রোহিণী কৃষ্ণকে যশোদার কোলে স্থাপন করলেন, তখন তিনি যেন তাঁর প্রাণ ফিরে পেলেন এবং দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন।

'হায় আমার পুত্র! হায় আমার পুত্র!' তিনি বারবার কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁপতে লাগলেন। তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল। কৃষ্ণকে কাপড়ের আঁচল দিয়ে ঢেকে কুরারী পাখীর ন্যায় কাঁদছেন আর কাঁদছেন।

কৃষ্ণ মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'মা, মা' বলে। রোহিণী ও অন্যান্য গোপীরা তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। যশোদা কাঁদছিলেন, কৃষ্ণ কাঁদছিলেন, রোহিণী কাঁদছিলেন, অন্যান্য গোপীরাও কাঁদছিলেন, তা দেখে নন্দবাবা আর স্থির থাকতে পারলেন না, তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন। তখন গভীর বাৎসল্য প্রেম ও মমতায় সমগ্র এলাকা প্লাবিত হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর যশোদা মাতা কিছুটা শান্ত হলেন এবং কৃষ্ণকে দুগ্ধপান করালেন। এর মধ্যে খাবারও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। নন্দবাবাকে ভোজনের জন্য ডাকা হল। তিনি বসলেন, কৃষ্ণ-বলরামকে বসালেন তাঁর বাঁয়ে ও ডাইনে। নন্দবাবা বললেন,—'কৃষ্ণ যাও, মাকে ডেকে নিয়ে এস। যদি তিনি না আসেন, তাহলে আমি কিছুই খাব না।' যশোদা এতই লজ্জিত ও বিব্রতবোধ করছিলেন যে, নন্দবাবার সামনে আসতে পারছিলেন না। কৃষ্ণ তাঁর কাপড় ধরে টানতে লাগলেন, তিনি বাধা দিতে পারলেন না। তাঁকে বাবার নিকট নিয়ে এলেন। নন্দবাবা তখন খেলেন, কৃষ্ণ-বলরামকে খাওয়ালেন এবং অবশিষ্ট কিছু রাখলেন যা যশোদার বাড়ীর অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করা হল। কৃষ্ণ এখন মা যশোমতীর কোলে, এবং সেদিন রাত্রে মায়ের সঙ্গে খুব শান্তিতে ঘুমিয়েছিলেন।

লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সুন্দর সুন্দর লীলা সম্পাদন করেন। কেন? যাঁরা তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালবাসেন, তাঁদের প্রেম ও ভক্তি আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ফল বিক্রয়িণীর সৌভাগ্য

কৃষ্ণকর্ত্তৃক আকর্ষিত

ঐ একই সময়ে কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করছিলেন, তখন মথুরার নিকটবর্ত্তী শহরে এক ফলবিক্রেতৃ মহিলা বাস করত। সে অসাধারণ সুমিষ্ট ফল বিক্রয় করত। সে গ্রামে গ্রামে ঘুরত, বিশেষ করে যেখানে বাচ্চারা থাকত। অলি-গলির মধ্য দিয়ে চিৎকার করতে করতে যেত আম, কলা, কমলা, পেয়ারা প্রভৃতি ফল নিয়ে। তার নিকটে এত সুন্দর সুন্দর পাকা ফল ছিল যে, বালকেরা সব তার পিছনে পিছনে দৌড়াত এবং ফলের জন্য কাকুতি-মিনতি করত।

তারা তাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরে ধরত এবং লোলুপদৃষ্টিতে বলত,—'মা, মা, আমি ঐ ফলটা চাই।' সে বালকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। একদা ঐ ফলওয়ালী নন্দনন্দনের নাম শুনেছিল। নন্দনন্দন অর্থাৎ নন্দরাজার পুত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণের নাম শুনে সে খুব আকর্ষণ অনুভব করল। কোন একজন তাকে বলেছিল, "যশোদা মা এক অতি সুন্দর বালকের জন্ম দিয়েছেন, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি এতই সুন্দর ও মনোহর যে, একবার যদি কেউ গোকুলে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে, সে আর অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। তারা তাদের চিত্ত ও মন তাঁর চরণে সমর্পণ করে শূন্য হস্তে গৃহে ফিরে আসে।" ফলওয়ালী এই কথা শ্রবণ করে উক্ত বালককে দেখার জন্য লালায়িত হল।

কৃষ্ণানুসন্ধানে

একদিন ঐ ফলবিক্রয়িণী এক ঝুড়ি সুন্দর সুন্দর ফল নিয়ে কলার ভেলায় যমুনা নদী অতিক্রম করে নয় (৯) মাইল দূরে গোকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। ফলবিক্রয়িণী গোকুলে প্রবেশ করে চিৎকার শুরু করল, যাতে ব্রজবাসীরা তার চিৎকার শুনে ফল কেনার জন্য আসে। সে 'ফল চাই', 'ফল চাই' বলে চিৎকার করতে চেয়েছিল ; কিন্তু কৃষ্ণ-ভাবনায় সে এতই বিভোর ছিল যে, 'ফল চাই' বলার পরিবর্ত্তে 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি!' 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি!' বলে ডাকতে শুরু করল।

সে আরও অধিক জোরে 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি' বলে ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভারতীয় মহিলারা হাত

স্পর্শ না করে মাথার উপর ঝুড়ি বহন করতে পারে। মাথার উপর দুই, তিন বা ততোধিক জলপূর্ণ কলসি পর পর রেখে অনায়াসে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে ব্রজগোপীরা এই কার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ।

ফলবিক্রয়িণী ঐভাবে চলছিল, তার হৃদয় কিন্তু ডুকরে ডুকরে 'কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর' বলে কাঁদছিল। সারাদিন ধরে নন্দগ্রামে ঘুরেছে, যেখানে কৃষ্ণ তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে বাস করছেন, কিন্তু কৃষ্ণ এলেন না। সে পরের দিন আবার এল, কিন্তু কৃষ্ণদর্শন তার হল না।

ফলবিক্রয়িণীর প্রতিজ্ঞা

তৃতীয় দিবসে সে প্রতিজ্ঞা করে বসল, 'যদি কৃষ্ণ আজ আমাকে দর্শন না দেন, তাহলে আমি আর ঘরে ফিরব না। আমার জীবন ত্যাগ করব।' এইপ্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সে কীর্ত্তনে মগ্ন হল। যখন 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি' এই ডাক তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল, তখন তিনি (কৃষ্ণ) আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তখন মায়ের কোলে বসেছিলেন। হঠাৎ ফলওয়ালীর নিকট যাওয়ার জন্য মায়ের কোল থেকে লাফ দিলেন।

কৃষ্ণ বয়স্কদের দেখেছিলেন দ্রব্য বিনিময় করতে। তিনি জানতেন যে, ফলওয়ালী তাঁকে ফল দেবে যদি বিনিময়ে তাকে কিছু দেন। বাহিরে আসার সময় তিনি দেখতে পেলেন এক বস্তা শস্যদানা। তা তিনি তাঁর ক্ষুদ্র হাতে কিছু তুলে নিয়ে দৌড়ে উঠানে এসে 'ওহে! আমি কিছু ফল চাই, আমি কিছু ফল চাই, আমাকে ফল দাও' বলতে লাগলেন।

ঐ ফলবিক্রয়িণী ছিল নীচু জাতের, তজ্জন্য সে দরজার বাহিরে অপেক্ষা করছিল। সে মা যশোদার বাড়ীতে, এমনকি উঠানে আসতে পারত না। যদিও কৃষ্ণ অদল-বদলের জন্য কিছু শস্যদানা আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র হাতে খুব বেশী শস্যদানা ধরে রাখতে পারেননি। তাই যখন তিনি দৌড়ে এলেন, তখন অধিকাংশ দানা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কয়েকটা মাত্র দানা তাঁর হাতে অবশিষ্ট ছিল। কৃষ্ণ কিন্তু তা লক্ষ্য করেননি। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, তাঁর এক হাত পূর্ণ শস্যদানা রয়েছে এবং এর বিনিময়ে ফলওয়ালী আমাকে প্রচুর ফল দেবে।

কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রেমের প্রতিদান দেন

যখন ফলওয়ালী কৃষ্ণকে দর্শন করল, সে তখন তাঁর অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য

দর্শন করে মোহিত হয়ে গেল। মাটিতে বসে বসে সে তাঁকে দর্শন করতে লাগল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কৃষ্ণকে তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করল।

'আমাকে ফল দাও, আমাকে ফল দাও'—কৃষ্ণ তাকে বললেন।

'তার বিনিময়ে তুমি আমাকে কি দেবে?'

'কেন, আমি হাতে করে প্রচুর শস্যদানা নিয়ে এসেছি।'

ফলওয়ালী হেসে বলল,—'ওহে বালক, তোমার হাতে ত' এক দানা ও শস্য নেই।'

কৃষ্ণ তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। সত্যিই ত' সব শস্যদানা পড়ে গেছে। তথাপিও তিনি ফল চাইলেন। ফলওয়ালী কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'যদি তুমি আমাকে 'মা' বলে একবার আমার কোলে এসে বস, তাহলে তুমি যত ফল চাও, সব আমি তোমাকে দেব।'

কৃষ্ণ এদিক-ওদিক চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন কেউ তাঁকে দেখছে কিনা। তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত প্রেমময় (ভক্তবৎসল)। কখনও ভাবতেন না যে, ভক্ত কোন্ শ্রেণীর, কি তার জাত, যদ্যপি তিনি নন্দরাজের পুত্ররূপে খেলা করছেন। তিনি চিন্তা করলেন,—"জানি না কি ঘটবে, যদি আমার মা বা ব্রজের অন্য কেউ আমাকে দেখে ফেলে যে, আমি ফলওয়ালীর কোলে বসেছি, এবং আমার সখারা কি বলবে যদি তারা শোনে যে আমি এই মহিলাকে 'মা' বলেছি।" সেজন্য তিনি একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কেউ তাঁকে দেখছে না, তখন তিনি ফলবিক্রয়িণীর কোলে লাফ দিয়ে বসলেন এবং 'মা' বলে ডেকেই পুনরায় লাফ দিয়ে কোল থেকে নেমে পড়ে দাবি করলেন,—'এখন আমাকে তোমার কিছু ফল দেওয়া উচিত।'

ফলবিক্রয়িণী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কৃষ্ণ সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। সে তাঁকে সমস্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণের হাত এতই ছোট ছিল যে, তিনি কেবলমাত্র দুটি আম ও একটী কলা নিতে পেরেছিলেন। ছোট ছোট বালকেরা যেমন করে, ঠিক তদ্রূপ কৃষ্ণ হাত দিয়ে ফলগুলো বক্ষে চেপে ধরে নাচতে লাগলেন।

কৃষ্ণ মায়ের কাছে গিয়ে সমস্ত ফল তাঁর কাপড়ের মধ্যে ঢেলে দিলেন। মাতা তাঁর সখীদের মধ্যে ফল বিতরণ করতে শুরু করলেন। তিনি খুব আনন্দিত

হয়েছিলেন, কেননা ফলের যোগান ছিল অফুরন্ত। তিনি সকল গোপীদের ফল দিলেন, তা সত্ত্বেও ফল আরও উদ্বৃত্ত হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর উক্ত ফল বিক্রয়িণীর কি হল? যখন কৃষ্ণ তার কোলে বসে 'মা' বলে ডেকেছিলেন, তখন তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতি ও ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁর সমস্ত চিত্ত সমর্পণ করে দিলেন। বহুক্ষণ যাবৎ নড়াচড়া করতে পারেন নি। ফটকের বাহিরে স্পন্দনহীন হয়ে বসেছিলেন। কেউ হয়ত' তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি এখানে কি জন্য বসে আছ?' তখন তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

রত্নপূর্ণ ঝুড়ি

ঘটনাক্রমে সন্ধ্যার দিকে ফলবিক্রয়িণী মাথায় ঝুড়ি নিয়ে গৃহের দিকে যাত্রা শুরু করল। যখন সে যমুনার তীরে এসে পৌঁছাল, তখন তার মনে হল যে, ঝুড়িটা খুব ভারী ভারী লাগছে, দেখি ত' এর মধ্যে কি আছে? ঝুড়িটা নামিয়ে যখন দেখল, তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। ঝুড়িটা অত্যাশ্চর্য্য বহুমূল্য মণিমুক্তাদিদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। যার এক একটীর মূল্য কংসের কোষাগারে রক্ষিত সমস্ত রত্নেরও সমান হবে না।

ফলবিক্রয়িণী সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে ধ্যানস্থ হলেন। যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করে বললেন,—'এই সব মণিমানিক্য দিয়ে কি হবে?' তারপর তিনি সমস্ত রত্ন যমুনার জলে ছুঁড়ে ফেললেন এবং মাথার উপরে হাত উঠিয়ে এক পাগলিনীর মত কীর্ত্তন করতে লাগলেন—'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।'

তখন তাঁর কোন অবগুণ্ঠন ছিল না, তা খুলে পড়েছিল। তিনি ক্রন্দন করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর কৃষ্ণচেতনা ব্যতীত কোনরূপ বাহ্যিক চেতনা ছিল না। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি কোথায় গেলেন, তা কেউ জানেন না। কেননা, তিনি আর কখনও বাড়ী ফিরে যায়নি। তাহলে গেলেন কোথায়? কে বলতে পারে? কৃষ্ণ তাঁর হৃদয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অভিহিত ছিলেন। কৃষ্ণ ভাবলেন,— 'তিনি আমার মায়ের মত।' তাঁকে এক সুন্দর অপ্রাকৃত শরীর প্রদান করলেন এবং শীঘ্রই তাঁর চিন্ময়ধাম গোলোক-বৃন্দাবনে স্থান প্রদান করলেন—যেখানে তিনি তাঁর নিত্য মাতার ন্যায় থাকবেন। কেবল তাঁর প্রাকৃত জড়শরীর যমুনার তীরে পড়ে রইল এবং লোকজন এসে তা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

হৃদয় হতে কীর্ত্তন

আপনাদের মনে হতে পারে, ঐ ফলবিক্রয়িণীকে অনুসরণ করা কঠিন। কিন্তু আপনাদের শ্রীগুরুদেব এসেছেন তা আপনাদের দান করার জন্য, করুণা বিতরণের জন্য। আপনারা তা কখনও বিষয়-বৈভব, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিংবা জগতের অন্য কিছু দিয়ে পরিশোধ করতে পারবেন না। আপনাদের এমন কিছু নেই যা দিয়ে গুরুদেবের ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন। আপনারা শ্রীগুরুদেবের মহিমা চিন্তা করুন এবং তিনি কে, তা উপলব্ধি করুন। কৃষ্ণ ফলবিক্রয়িণীকে যে অপ্রাকৃত সম্পদ্ দান করেছিলেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই অপ্রাকৃত সম্পদ্ আপনাদেরকে দিতে চান। আপনাদের গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করবেন না এবং দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম হেলায় হারাবেন না। এইমুহূর্ত্তে আপনারা উক্ত সৌভাগ্যবতী ফলওয়ালীর ন্যায় কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ করুন এবং সর্ব্বদা 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি' 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি' 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি' 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি'—এই গান কীর্ত্তন করুন।

কিভাবে গান গাইবেন? এখন আপনি সাধারণ একটী গান যেভাবে গাইছেন, সেভাবে নয়। আপনাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, অন্তঃকরণ হতে কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করুন, তাহলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তা শুনবেন। অন্যথায় যদি একজন পেশাদারের ন্যায় গান করেন—যার মধ্যে কোন হৃদয় নেই, কোন ভাব নেই, কোন অনুভূতি নেই, সেরূপ গান কৃষ্ণের কোন প্রয়োজনে লাগবে না। কৃষ্ণ নিজেই সকল গান জানেন। তিনি আপনার হৃদয় চান। একজন কনিষ্ঠ ভক্তও দক্ষভাবে কীর্ত্তন করতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ আরও অধিক আশা করেন।

আপনারা আপনাদের সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করতে চেষ্টা করুন, তখন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আপনাদের ডাক শুনবেন। আপনি যা কিছু গান করেন, যে কোন কিছু কীর্ত্তন করেন, তাতে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যান। আর যদি গান করার জন্য গান করেন, তাহলে আপনার গান তাঁর কর্ণগোচর কখনই হবে না ; কিন্তু যদি অন্তঃকরণ দিয়ে ভাবের সহিত কীর্ত্তন করেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ আপনার নিকট উপস্থিত হবেন এবং এই অপ্রাকৃত সম্পদ্ আপনাদেরকে প্রদান করবেন।

****